মার্চ ২০২৪ ■ বর্ষ ০৯ ■ সংখ্যা ০৩

বন্দর বার্তা

মেরিটাইম বিষয়ক মাসিক প্রকাশনা

টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট, ১৯৭৪

যুগের চেয়ে এগিয়ে থাকা আইনের সুবর্ণজয়ন্তী

বৈশ্বিক শিপিং খাতে দীর্ঘমেয়াদি স্থবিরতার আশঙ্কা আঙ্কটাডের

কনটেইনার জাহাজের আদ্যোপান্ত

সমুদ্রসম্পদ আহরণে আমাদের কাজ করতে হবে
প্রধানমন্ত্রী

মার্চ ২০২৪
বর্ষ ০৯, সংখ্যা ০৩

বন্দরবার্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের মেরিটাইম
বিষয়ক মাসিক প্রকাশনা

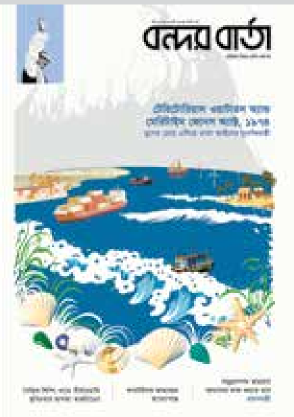

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল,
ওএসপি, এনইউপি, পিপিএম, পিএসসি

সম্পাদক
মো. হাবিবুর রহমান

সম্পাদনা পর্ষদ
রম্য রহিম চৌধুরী
মো. মমিনুর রশিদ
মো. ওমর ফারুক
মাহবুব মোরশেদ চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
তাজুল হক

সহযোগী সম্পাদক
বিপ্লব সরকার

নিয়মিত প্রদায়ক
এনামুল করিম
কাজী মেরাজ উদ্দিন আরিফ
শরিফুল আলম শিমুল
ইলোরা শারমীন

প্রতিবেদক
ওমর ফারুক ইমন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মনির খান শিমুল

জনসংযোগ
এ এন এম ফারুক হোসেন চৌধুরী
মোহাম্মদ তারেক

আলোকচিত্রী
এস এম শামসুল হুদা

ডিজাইন ও ডিটিপি
তৌফিক আহমেদ
আবিদা হাফছা
মাহমুদ হোসেন প্রিন্স
মির্জা নাঈম অলিউল্লাহ্

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
হাবিবুর রহমান সুমন, আলেয়া ফেরদৌসী

প্রকাশক চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ-এর পক্ষে
কনটেন্ট পরিকল্পনা ও প্রণয়ন,
ডিজাইন, প্রকাশনা :

ENLIGHTEN | VIBES

বাড়ি ০৬, সড়ক ০৩, সেক্টর ০৫
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন : ০২-৪৮৯৫৬৭৪৮
ইমেইল : enlightenvibes@gmail.com

সম্পাদকীয় যোগাযোগ
বন্দরবার্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
বন্দরভবন, ৩য় তলা, চট্টগ্রাম।
ফোন : ০২-৩৩৩৩৩০৮৬৯
ইমেইল : bandarbarta@gmail.com

সম্পাদকীয়

বঙ্গবন্ধু প্রণীত টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট, ১৯৭৪ ছিল ন্যায্যতার ভিত্তিতে সমুদ্রসম্পদের শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের পথপ্রদর্শক

সময়ের চেয়েও এগিয়ে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান; ব্যতিক্রম ছিলেন না নদী ও সমুদ্রকেন্দ্রিক উন্নয়ন নিয়ে তাঁর ভাবনা ও প্রজ্ঞায়। নদী ও সমুদ্র সম্পদের উন্নয়নে সাহসিকতা ও দূরদর্শিতার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছিলেন বলেই বঙ্গবন্ধুকে বলা হয় বাংলাদেশের মেরিটাইম ভিশনের স্থপতি। পাঁচ দশক আগে তিনি টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট, ১৯৭৪ প্রণয়ন করেন, যা পরবর্তীতে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের আঞ্চলিক জলসীমা ও সামুদ্রিক অঞ্চল নির্ধারণে প্রধান রূপকল্প হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এই আইন সমুদ্রসীমা নির্ধারণের জন্য আইনি কাঠামোর পাশাপাশি সমুদ্র ও সামুদ্রিক সম্পদের ওপর অধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ভিত্তি তৈরি করে। সামুদ্রিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও সমুদ্র বিজ্ঞানবিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রেও এটি একটি রূপরেখা সৃষ্টি করে। এই আইনটি প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে ন্যায্যতার ভিত্তিতে সমুদ্রসম্পদের শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের পথপ্রদর্শক ছিল।

বঙ্গবন্ধু এ অঞ্চলের সমুদ্র আইনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনসহ বিভিন্ন ঝুঁকি মোকাবিলায় শত ব্যস্ততা ও প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি সমুদ্রের উন্নয়নে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। সেই ধারাবাহিকতায় বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক সম্পদের ওপর বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সমুদ্রসম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণের জন্য বঙ্গবন্ধু সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদের ২ নম্বর ধারা অনুযায়ী সমুদ্রসীমা-সংক্রান্ত 'টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট, ১৯৭৪' প্রণয়ন করেন। এই সমুদ্র আইনের সুবর্ণজয়ন্তীতে আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি আমাদের অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট, ১৯৭৪ প্রণয়নের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২২ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সেশনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনাদর্শের একটি বিশেষ দিক ছিল সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং সমুদ্রভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এই রাজনৈতিক দর্শনের প্রকাশ বঙ্গবন্ধুর জীবৎকালে বহুবার হয়েছে। আর ৫০ বছর পরও যখন তার প্রণীত টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট সমানভাবে প্রাসঙ্গিক থাকে, তখন বোঝা যায় এটি কতটা বাস্তবভিত্তিক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিল। একই সাথে আয়োজিত সেমিনারে আলোচকরা বলেন, বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের তৃতীয় প্রতিবেশী। সমুদ্রপথে দক্ষিণ এশিয়ার গেটওয়ে হয়ে ওঠার সব সম্ভাবনা রয়েছে বাংলাদেশের। সমুদ্র বিজয়ের পর আমাদের জন্য সুযোগ এসেছে সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা পুরোপুরি কাজে লাগানোর। সমুদ্র বাণিজ্য, বন্দর ব্যবস্থাপনা, মৎস্য ও খনিজ সম্পদ আহরণ, ট্রান্সশিপমেন্ট-ট্রানজিট সেবা, অফশোর প্রকল্প ইত্যাদি বাংলাদেশের সুনীল অর্থনৈতিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হয়ে উঠতে পারে।

১৯৭৪ সালে প্রণীত আইনটি বাংলাদেশের উপকূলীয় সামুদ্রিক সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা, সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা, সমুদ্র পরিবহন, মৎস্যসম্পদ ও সামুদ্রিক সুশাসনের মতো বিষয়গুলো নির্ধারণ করা সহজতর করেছে। সবচেয়ে বড় কথা, আইনটি বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণাধীন সমুদ্রাঞ্চলের বিভিন্ন জোনের সীমা নির্ধারণ, অধিকারের ব্যাপ্তি, সুরক্ষা ও নিরাপত্তার রোডম্যাপ নির্ধারণ করে দিয়েছিল। এটি বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের কতখানি অংশে সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, সেই অংশে দেশের স্বার্থ কীরূপ হবে এবং এই স্বার্থের সুরক্ষা হবে কীভাবে–এসব বিষয় নির্ধারণে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল। এতে করে বাংলাদেশের জন্য স্বাধীনভাবে নিজেদের সমুদ্রসীমার ব্যবস্থাপনার সুযোগ তৈরি হয়েছিল। এক কথায় বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চলে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা, বহির্বিশ্বের সাথে নিরবচ্ছিন্ন বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপন তথা দেশের সামুদ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির ভিত রচনা করেছিল এই আইন। সাম্প্রতিক সময়ে সমুদ্র অর্থনীতির জোয়ার ও ভূরাজনৈতিক পটপরিবর্তন বাংলাদেশের জন্য বঙ্গোপসাগরের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। অর্থনৈতিক গুরুত্বের কথা চিন্তা করলে দেখা যায়, বঙ্গোপসাগর শুধু ঐশ্বর্যমণ্ডিত এক বিশাল লবণাক্ত জলরাশিই শুধু নয়, এটি ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়ায় সম্ভাবনাময় একটি অবলম্বনও। সুবর্ণজয়ন্তীতে এই সমুদ্র আইন নিয়ে বিস্তারিত রয়েছে প্রধান রচনায়।

প্রিয় পাঠক, আমরা চাই এ দেশের মেরিটাইম চর্চাকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড় করাতে। বৈচিত্র্যময় আঙ্গিকে, সমৃদ্ধ কলেবরে বন্দরবার্তার পথচলা বাংলাদেশের মেরিটাইম খাতের বিকাশে আরও সহায়ক হবে–সেই প্রত্যাশা। সবাইকে শুভেচ্ছা।

বন্দর বার্তা

এ সংখ্যায় থাকছে

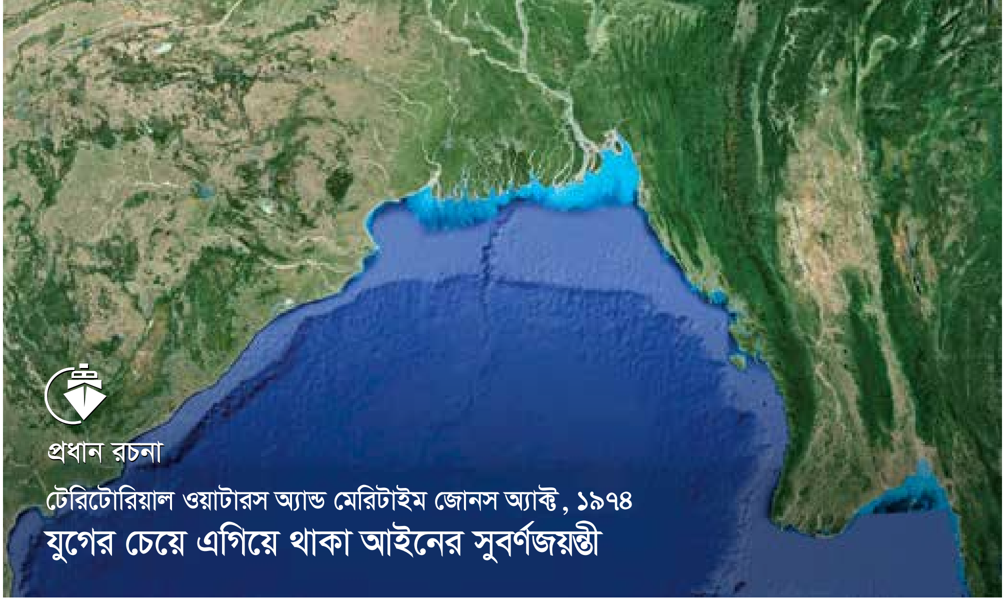

প্রধান রচনা

টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট, ১৯৭৪
যুগের চেয়ে এগিয়ে থাকা আইনের সুবর্ণজয়ন্তী

০৪

দূরদর্শী নেতৃত্ব কীভাবে একটি দেশকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর সাহস জোগাতে পারে, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৯৭৪ সালে তাঁর উদ্যোগে প্রণীত টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট। এই যে আমরা এখন সুনীল অর্থনীতির বিকাশ নিয়ে পরিকল্পনা সাজাচ্ছি, তার পটভূমি তৈরি করে দিয়েছে আইনটি। সেই আইনের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হচ্ছে চলতি বছর।

সম্পাদকীয় ▪ ০২

আন্তর্জাতিক সংবাদ ▪ ১৩

- জাহাজের মালিকানায় আধিপত্য বজায় রেখেছে জাপান, চীন ও গ্রিস
- ইটিএস কার্যকর হলে এশিয়া থেকে ১১০ কোটি ডলার ট্যাক্স পাবে ইইউ
- ব্যালাস্ট ও স্ক্রাবার ওয়াটারের নমুনা সংগ্রহ সহজ করেছে নরম্যাক
- যুদ্ধ-ঝুঁকির প্রিমিয়াম ৯০০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে : আঙ্কটাড
- মেরিন ফুয়েল হিসেবে অ্যামোনিয়া ব্যবহারের নেতিবাচক প্রভাব দেখছেন গবেষকরা
- ক্রুড ট্যাংকার নির্মাণ খাতে সুদিন, নির্মাণ ব্যয় বেড়েছে ৫০ শতাংশ
- চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় কনটেইনার জাহাজের ভাড়াও বেড়েছে
- পানামা খালের উন্নয়নে রেকর্ড মূলধনি বিনিয়োগের ঘোষণা
- জাহাজে সাজানো কনটেইনার ধসে পড়া নিয়ে গবেষণা নরওয়েজিয়ান বীমা কোম্পানির

সংখ্যা এবং লেখচিত্র ▪ ২৩

- ব্লু কার্বন

খতিয়ান ▪ ২৩

- বন্দরে কনটেইনার ওঠানামার তুলনামূলক মাসিক পরিসংখ্যান

মুখর বন্দর ▪ ১৯

- প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় নামমাত্র মূল্যে জমি পাচ্ছে বে-টার্মিনাল প্রকল্প
- সমুদ্রসম্পদ আহরণে আমাদের কাজ করতে হবে : প্রধানমন্ত্রী
- রপ্তানি পণ্য স্ক্যানিংয়ে কাস্টমসে দুটি স্ক্যানার হস্তান্তর করেছে চট্টগ্রাম বন্দর
- বাংলাদেশ-থাইল্যান্ডে সরাসরি জাহাজ চলবে
- যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করেছে চট্টগ্রাম বন্দর
- তেল পরিবহনে বছরে খরচ কমবে ৮০০ কোটি টাকা
- তিন সমুদ্রবন্দর ব্যবহারে আগ্রহী নেপাল
- রপ্তানি বৃদ্ধিতে বন্দর সেবা আরও সহজতর করার দাবি ব্যবসায়ীদের
- চট্টগ্রাম বন্দরে বিএসটিআই ল্যাবের আধুনিকায়ন চায় এফবিসিসিআই

বন্দর বিচিত্রা ▪ ১৭

বন্দর পরিচিতি : চার্লসটন বন্দর

গ্রন্থ পরিচিতি : সেইলিং স্কুল : নেভিগেটিং সায়েন্স অ্যান্ড স্কিল, ১৫৫০-১৮০০

মেরিটাইম ফ্যাক্ট : রো-রো জাহাজ ও ফেরি

মেরিটাইম ব্যক্তিত্ব : ম্যালকম পুরসেল ম্যাকলিন

মেরিটাইম ইভেন্টস : মেরিটাইম বিষয়ক নানা আয়োজনের সূচি

১০

বিশেষ রচনা

কনটেইনার জাহাজের আদ্যোপান্ত

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ৮০ শতাংশের বেশি সমুদ্রপথে পরিবাহিত হয়। স্বল্প সময়ে নিরাপদে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পণ্য পরিবহনের মূল কারিগর কনটেইনার জাহাজ। কনটেইনার শিপিংয়ের বিবর্তন পণ্য পরিবহন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে আরও দক্ষ, সাশ্রয়ী ও সহজ করে তুলেছে। ১৮ শতকের শেষদিকে ইংল্যান্ডের কয়লা খনিগুলোকে ঘিরে সর্বপ্রথম কনটেইনারাইজেশনের উৎপত্তি ঘটে। বর্তমানে ৬ হাজার কনটেইনার জাহাজের বিশাল বাণিজ্যিক নৌবহর প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে আনুমানিক ২২ কোটি ৬০ লাখ কনটেইনার পরিবহন করে।

২০

বড় জাহাজ ভেড়ানোয় বেড়েছে কনটেইনার হ্যান্ডলিং

চট্টগ্রাম বন্দরে বড় জাহাজ ভেড়ানোর সুযোগ তৈরি হয় গত বছরের জানুয়ারিতে। নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী ১০ মিটার ড্রাফট এবং ২০০ মিটার দৈর্ঘ্যের জাহাজ ভেড়ানোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এর সুফল এখন দৃশ্যমান হচ্ছে। গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় এবার জুলাই থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত সাত মাসে বন্দরে বেড়েছে কনটেইনার হ্যান্ডলিং। একই জাহাজে অধিক পরিমাণে কার্গো ও কনটেইনার পরিবহন করা যায় বলেই এখন বন্দরে জাহাজের যাতায়াত কমছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত গত সাত মাসে চট্টগ্রাম বন্দরে–

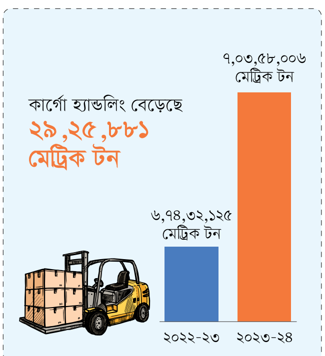

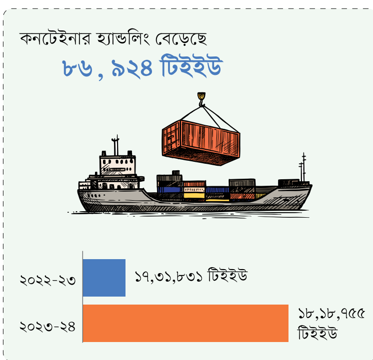

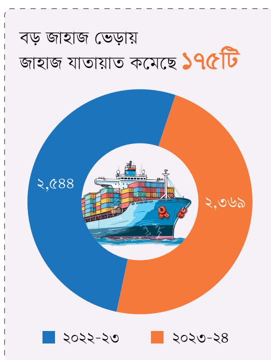

ইভি ইনফোগ্রাফিকস

১৩

আন্তর্জাতিক সংবাদ

বৈশ্বিক শিপিং খাতে দীর্ঘমেয়াদি স্থবিরতার আশঙ্কা আঙ্কটাডের

প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট আপদের কারণে লোহিত সাগর, কৃষ্ণ সাগর ও পানামা খালের মতো গুরুত্বপূর্ণ শিপিং রুটগুলো গতি হারানোর ঝুঁকিতে, যা দীর্ঘমেয়াদি মূল্যস্ফীতি, খাদ্যনিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে যাওয়া ও জ্বালানি সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার সংকট তৈরি করতে পারে। জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থা আঙ্কটাড সম্প্রতি 'নেভিগেটিং ট্রাবলড ওয়াটারস: দ্য ইম্প্যাক্ট অন গ্লোবাল ট্রেড অব ডিসরাপশন অব শিপিং রুটস ইন দ্য রেড সি, দ্য ব্ল্যাক সি অ্যান্ড দ্য পানামা ক্যানেল' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে এমন সতর্কবার্তা দিয়েছে।

টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট, ১৯৭৪

যুগের চেয়ে এগিয়ে থাকা আইনের সুবর্ণজয়ন্তী

দূরদর্শী নেতৃত্ব কীভাবে একটি দেশকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর সাহস জোগাতে পারে, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৯৭৪ সালে তার উদ্যোগে প্রণীত টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট। এই যে আমরা এখন সুনীল অর্থনীতির বিকাশ নিয়ে পরিকল্পনা সাজাচ্ছি, তার পটভূমি তৈরি করে দিয়েছে আইনটি। প্রতিবেশী দুই দেশের সাথে সমুদ্র বিজয়ের ভিত রচনা করেছিল চুয়াত্তরের সমুদ্র আইনটি। এটি কেবলই একটি আইন নয়, এটি ছিল একটি ভিশন, যার সুফল আমরা পেতে শুরু করেছি। সেই আইনের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হচ্ছে চলতি বছর।

বন্দরবার্তা ডেস্ক

সমুদ্রের রোমাঞ্চ অনুভব করেন না, এমন মানুষ বোধ হয় খুব বেশি পাওয়া যাবে না। তবে রাষ্ট্রের কাছে কেবলই সৌন্দর্যের ধারক বিশাল জলরাশি নয়, বরং এর গুরুত্ব আরও ব্যাপক ও বহুমাত্রিক। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনাময় এক অবলম্বন হতে পারে বিশাল এই জলরাশি। সমুদ্রভিত্তিক সুনীল অর্থনীতি উপকূলীয় দেশগুলোর জন্য অপার সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও দক্ষিণ সীমানায় থাকা বঙ্গোপসাগর সম্পদের জোগান নিয়ে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে।

বাংলাদেশ নামের বিশ্বের সবচেয়ে বড় এই বদ্বীপ গড়ে উঠেছে যার কোল ঘেঁষে, সেই বঙ্গোপসাগর ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিবেচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের নদ-নদী ও সমুদ্র যে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হয়ে উঠতে পারে, তা অনেক আগেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যে জলরাশি বাংলাদেশের অস্তিত্বের অংশ, সঠিক পরিকল্পনা না থাকলে অদূর ভবিষ্যতে তার সুরক্ষা বিনষ্ট হতে পারে এমন আশঙ্কা ছিল তার। সে কারণেই স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনসহ বিভিন্ন ঝুঁকি মোকাবিলায় শত ব্যস্ততা ও প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি সমুদ্রের উন্নয়নে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। নদী ও সমুদ্রসম্পদের উন্নয়নে সাহসিকতা ও দূরদর্শিতার সঙ্গে অসাধ্য কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছিলেন বলেই বঙ্গবন্ধুকে বলা হয় মেরিটাইম ভিশনের স্থপতি।

সমুদ্র অর্থনীতির গুরুত্ব অনুধাবন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাশিয়া সরকারের সহায়তায় যুদ্ধবিধ্বস্ত চট্টগ্রাম বন্দর চ্যানেলের বিভিন্ন স্থানে নিমজ্জিত-অর্ধনিমজ্জিত জাহাজও অবিস্ফোরিত মাইন অপসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক সম্পদের ওপর বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সমুদ্রসম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণের জন্য বঙ্গবন্ধু সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদের ২ নম্বর ধারা অনুযায়ী সমুদ্রসীমা-সংক্রান্ত 'টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট, ১৯৭৪' প্রণয়ন করেন।

সারা বিশ্বে নীতিনির্ধারকরা সমুদ্রসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য এ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়নে আগ্রহী হয়েছিলেন মূলত নব্বইয়ের দশক ও এর পরবর্তী সময়ে। সেখানে বঙ্গবন্ধু এই উদ্যোগ নিয়েছে তারও আগে। যার ফলে আন্তর্জাতিক আইন ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন অন দ্য ল' অব দ্য সির (আনক্লস-থ্রি) আট বছর আগেই বাংলাদেশে টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট প্রণীত হয়েছিল।

১৯৭৪ সালে প্রণীত আইনটি বাংলাদেশের উপকূলীয় সামুদ্রিক সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা, সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা, সমুদ্র পরিবহন, মৎস্যসম্পদ ও সামুদ্রিক সুশাসনের মতো বিষয়গুলো নির্ধারণ করা সহজতর করেছে। সবচেয়ে বড় কথা, আইনটি বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণাধীন সমুদ্রাঞ্চলকে কয়েকটি জোনে ভাগ করে এ-সংক্রান্ত সীমা নির্ধারণ, অধিকারের ব্যাপ্তি, সুরক্ষা ও নিরাপত্তার রোডম্যাপ নির্ধারণ করে দিয়েছিল।

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় সমুদ্রভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিসর বেড়েছে। একই সঙ্গে বেড়েছে টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্টের প্রাসঙ্গিকতা। ফলস্বরূপ আইনটিকে সময়োপযোগী করতে ২০২১ সালে প্রণয়ন করা হয় টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট। এই সংশোধনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমুদ্রবিষয়ক জাতীয় আইনকে আইএমও প্রণীত আন্তর্জাতিক আইন আনক্লস-থ্রির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সামুদ্রিক রূপরেখার ভিত

চুয়াত্তরের টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট নবীন বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণের রূপরেখা দিয়েছিল। বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের কতখানি অংশে সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, সেই অংশে দেশের স্বার্থ কীরূপ হবে এবং এই স্বার্থের সুরক্ষা হবে কীভাবে-এসব বিষয় নির্ধারণে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল এই রূপরেখা। এতে করে বাংলাদেশের জন্য বহির্বিশ্বের চাপমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে নিজেদের সমুদ্রসীমার ব্যবস্থাপনার সুযোগ তৈরি হয়েছিল। এক কথায় বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চলে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা, বহির্বিশ্বের সাথে নিরবচ্ছিন্ন বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপন তথা দেশের সামুদ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির ভিত রচনা করেছিল এই আইন।

অ্যাক্টটিতে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের জলসীমাকে কয়েকটি জোন বা অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো

সমুদ্রসম্পদের উন্নয়নে সাহসিকতা ও দূরদর্শিতার সঙ্গে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছিলেন মেরিটাইম ভিশনের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

হলো-উপকূলীয় তটরেখা, টেরিটোরিয়াল জলসীমা, কন্টিগিউয়াস জোন, একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (ইইজেড) ও মহীসোপান (কন্টিনেন্টাল শেলফ)।

টেরিটোরিয়াল ওয়াটার : উপকূলীয় তটরেখা থেকে ১২ নটিক্যাল মাইল দূরত্ব পর্যন্ত এলাকা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমা (টেরিটোরিয়াল ওয়াটার)। এই সীমার মধ্যে বাংলাদেশ পূর্ণমাত্রায় সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে এবং সেখানে জাহাজ চলাচল, মৎস্য শিকার ও সম্পদ আহরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

কন্টিগিউয়াস জোন : টেরিটোরিয়াল সমুদ্রাঞ্চলের পর তটরেখা থেকে ২৪ নটিক্যাল মাইল দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত জলসীমাকে কন্টিগিউয়াস জোন ধরা হয়। অর্থাৎ এই জোনের বিস্তার ১২ নটিক্যাল মাইল। বাংলাদেশ সেখানে শুল্কায়ন, অভিবাসন ও পরিবেশগত সুরক্ষাবিষয়ক যেকোনো আইন প্রয়োগ করতে পারবে।

ইইজেড : তটরেখা থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল দূরত্ব পর্যন্ত সমুদ্রাঞ্চল বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (ইইজেড) হিসেবে চিহ্নিত। অনেক সময় টেরিটোরিয়াল জোনের পর থেকেই ইইজেড শুরু বলে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ কন্টিগিউয়াস জোনকেও ইইজেডের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ হিসাবে ইইজেডের বিস্তার ১৮৮ নটিক্যাল মাইল। এখানকার সামুদ্রিক সব সম্পদের ওপর কেবল বাংলাদেশেরই সার্বভৌম অধিকার রয়েছে। টেকসই উপায়ে মৎস্যসম্পদ, জীবাশ্ম জ্বালানি ও অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ আহরণের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাকা গতিশীল করার ক্ষেত্রে এই অঞ্চলটি কৌশলগত দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মহীসোপান : ইইজেডের পর তটরেখা থেকে ৩৫০ নটিক্যাল মাইল দূরত্ব পর্যন্ত সমুদ্রাঞ্চল হলো মহীসোপান। অর্থাৎ মহীসোপানের বিস্তার ১৫০ নটিক্যাল মাইল। মেরিটাইম জোনস অ্যাক্টের মাধ্যমে এই অঞ্চলে সাগরতলের যেকোনো প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণের অধিকার পেয়েছে বাংলাদেশ।

টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট কেবল যে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমাই নির্ধারণ করেছিল, তা নয়। বরং এতে সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সমুদ্র নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এটি কেবলই একটি অভ্যন্তরীণ আইন ব্যবস্থা ছিল না, একই সঙ্গে এটি ছিল দেশের সমুদ্রবিষয়ক কৌশলগত কূটনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। সমুদ্রে একটি দেশের সার্বভৌমত্বের সীমা নির্ধারণ করা থাকলে প্রতিবেশী দেশগুলো ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে কূটনৈতিক ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক জোরদারের আদর্শ পরিবেশ তৈরি হয়, যা আঞ্চলিক শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট সেই সুযোগটিই করে দিয়েছিল।

এই যে সম্পদে পরিপূর্ণ একটি জলসীমা, তার সুরক্ষা, বিদেশি জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সময়োপযোগী সব সমুদ্রনীতি গ্রহণ করে যাচ্ছে। আর এসব নীতির মূল ভিত্তিই হলো টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট, যার প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রাগুলোর অন্যতম ছিল সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা। এই ভিতের সুবাদেই বাংলাদেশ বদ্বীপ মহাপরিকল্পনা-২১০০ এর মতো বিশদ রূপরেখা প্রণয়নের সুযোগ পাচ্ছি আমরা।

সাগর, তুমি কার?

সমুদ্রবিষয়ক আইনের প্রাথমিক ও প্রধান লক্ষ্য হলো সাগরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা। এই আইনের মাধ্যমে একটি উপকূলীয় রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সমুদ্রসীমা এবং সেই সমুদ্রসীমায় দেশটির অধিকার ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট হয়। আধুনিক যুগের গোড়ার দিকে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের রাজারা স্থলের পাশাপাশি জলেও আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় লিপ্ত থাকতেন। এতে মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন সাম্রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষ লেগে যেত। এই দ্বন্দ্ব নিরসনে সাম্রাজ্যগুলোর সমুদ্রসীমা চিহ্নিতকরণের প্রয়োজনীয়তা

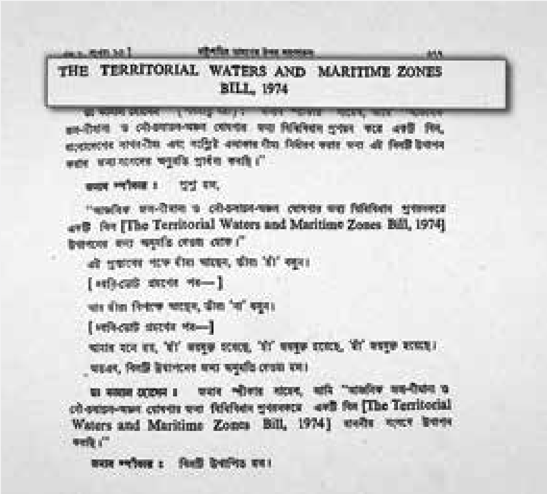
THE TERRITORIAL WATERS AND MARITIME ZONES BILL, 1974

[The Territorial Waters and Maritime Zones Bill, 1974]

[The Territorial Waters and Maritime Zones Bill, 1974]

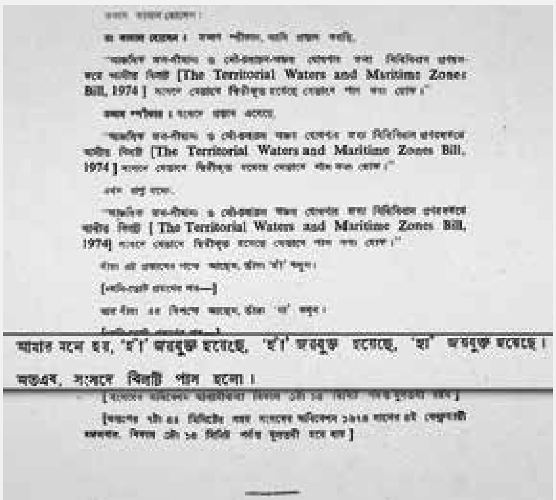
[The Territorial Waters and Maritime Zones Bill, 1974]

[The Territorial Waters and Maritime Zones Bill, 1974]

[The Territorial Waters and Maritime Zones Bill, 1974]

আমার মনে হয়, 'হাঁ' জয়যুক্ত হয়েছে, 'হাঁ' জয়যুক্ত হয়েছে, 'হাঁ' জয়যুক্ত হয়েছে।

অতএব, সংসদে বিলটি পাস হলো।

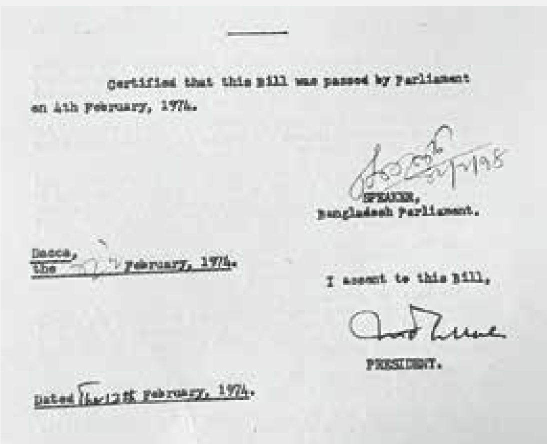
Certified that this Bill was passed by Parliament on 4th February, 1974.

SPEAKER,
Bangladesh Parliament.

Dacca,
the ... February, 1974.

I assent to this Bill,

PRESIDENT.

Dated ... February, 1974.

সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদের ২ নম্বর ধারা অনুযায়ী সমুদ্রসীমা-সংক্রান্ত 'টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট, ১৯৭৪' সংসদে উত্থাপনের পর কণ্ঠভোটে বিলটি পাস করা হয়

দেখা দেয়। সমুদ্র কারো নিয়ন্ত্রণে থাকা যুক্তিসংগত কি না, কিংবা যুক্তিসংগত হলে কোন অংশের নিয়ন্ত্রণ কার নিয়ন্ত্রণে থাকবে, সেই প্রশ্ন তৈরি হয়।

এই বিষয়ে ডাচ আইনজ্ঞ হুগো গ্রোশিয়াস ১৬০৯ সালে একটি বই প্রকাশ করেন, যার নাম মেয়ার লিবেরাম। এই শব্দযুগলের অর্থ 'মুক্ত সাগর' বা 'সাগরের স্বাধীনতা'। বইটিতে হুগো বলেন, সাগর কারও একক নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিত নয়। বরং সাগরে সম্পদ সন্ধান, আহরণ ও বাণিজ্যের সুযোগ সবার জন্য সমান থাকা উচিত। মেয়ার লিবেরামে দুটি মূলনীতির কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো– গভীর সাগর ব্যবহারের অধিকার সব দেশেরই থাকা উচিত এবং কোনো দেশ এর মালিকানা দাবি করতে পারবে না। মেয়ার লিবেরামের এই 'মুক্ত সাগর'নীতি পরবর্তী চারশ বছর সমুদ্রবিষয়ক আইনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।

অবশ্য মেয়ার লিবেরামের কয়েক দশকের মধ্যে এর বিপরীত আরেকটি নীতি আত্মপ্রকাশ করে। ১৬৩৫ সালে ব্রিটিশ পণ্ডিত জন সেলডেন প্রকাশ করেন বই মেয়ার ক্লসাম, যার অর্থ 'সীমাবদ্ধ সাগর'। রোমান যুগের মেয়ার নস্ট্রাম (আমাদের সাগর) নীতির সাথে জন সেলডেনের নীতির অনেকটা মিল ছিল। সেলডেন বলেন, ভূপৃষ্ঠের বেশিরভাগ অংশই যেমন কোনো-না কোনো রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে থাকে, তেমনি সাগরও নিয়ন্ত্রণাধীন থাকা উচিত। এর পেছনে তিনি যুক্তি দেখান, যেহেতু উপকূলীয় দেশগুলোকে জলদস্যুতার মতো সামুদ্রিক ঝুঁকির মোকাবিলা করতে হয়, সেহেতু এসব দেশের উপকূল-সংলগ্ন সমুদ্রে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অধিকার রয়েছে।

যা-ই হোক, মেয়ার লিবেরাম ও মেয়ার ক্লসাম-এই দুই বিপরীত তত্ত্বের কারণে সমুদ্রে উপকূলীয় রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌম অধিকার নিয়ে চলে আসা দীর্ঘদিনের বিসংবাদ থেকেই গেল। পরবর্তী শতকগুলোয় এই সংকট নিরসনে বেশ কয়েক দফায় উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৮৫৬ সালের প্যারিস ডিক্লেয়ারেশনে প্রাইভেটিয়ারিং, নিরপেক্ষ পতাকা, নিরপেক্ষ পণ্য নির্ধারণসহ আরও কয়েকটি ইস্যুতে দ্বন্দ্ব নিরসনে কিছু সিদ্ধান্ত আসে। তবে সেই সিদ্ধান্তগুলো কোনো আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা নয়। কেবল ক্রাইমিয়া যুদ্ধে (১৮৫৩-১৮৫৬) বিবদমান দেশগুলোই এই চুক্তির প্রতি সমর্থন জানায়।

বিশ শতকের শুরুর দিকে বিভিন্ন দেশ তাদের সামুদ্রিক খনিজ ও মৎস্যসম্পদের মজুদ ও সর্বোচ্চ আহরণ নিশ্চিতকরণ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণে তৎপরতা শুরু করে। এ লক্ষ্যে দেশগুলো নিজেদের সমুদ্রসীমারে পরিধি বাড়ানোর চেষ্টা চালাতে থাকে। ১৯২০-এর দেশগুলো তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে তৎকালীন লিগ অব নেশনসে ধরনা দিতে থাকে। এই তৎপরতার ফল হিসেবে আসে বিখ্যাত 'ক্যানন শট রুল', যে আইনের মাধ্যমে উপকূলীয় দেশগুলোকে তটরেখা থেকে তিন নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত সমুদ্রাঞ্চলে সার্বভৌম অধিকার দেওয়া হয়। আইনে বলা হয়, উপকূলীয় তটরেখা থেকে নিক্ষেপ করা কামানের গোলা সাগরে যত দূর যায়, সেই দূরত্ব পর্যন্ত অঞ্চল টেরিটোরিয়াল ওয়াটার হিসেবে বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে একটি প্রমাণ দূরত্ব হিসেবে তিন নটিক্যাল মাইল গ্রহণ করা হয়। এই কামানের গোলার অতিক্রান্ত দূরত্বের কারণেই আইনটিকে ক্যানন শট রুল বলা হয়।

বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বিভিন্ন পেক্ষাপটে সাগরে দেশগুলোর সার্বভৌম অধিকার বৃদ্ধির দাবি জোরালো হতে থাকে। এ সময় সমুদ্রে মৎস্য আহরণকারী জাহাজগুলোর কাছ থেকে টোল আদায়, সামুদ্রিক খনিজ সম্পদ আহরণ ইত্যাদিকে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক বিবেচনা করা শুরু হয়। ১৯৪৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র তাদের টেরিটোরিয়াল জোনের বাইরে মহীসোপান অঞ্চলের সমুদ্র ও এর তলদেশের সব প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর অধিকার দাবি করে ঘোষণা দেয়। সেই প্রথম কোনো দেশ মহীসোপান অঞ্চলে নিজেদের অধিকারের দাবি জানায়। এর মাধ্যমে গভীর সাগরের সর্বজনীন ব্যবহার নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়। এই বিতর্ক আরও জোরালো হয়, যখন লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের দেখানো পথে হাঁটতে শুরু করে। তারা ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত সমুদ্র অঞ্চলকে কয়েকটি জোনে ভাগ করে সেখানে নিজেদের অধিকারের দাবি জানায়। জোনগুলোর মধ্যে রয়েছে, টেরিটোরিয়াল সি, এপিকন্টিনেন্টাল সি, প্যাট্রিমোনিয়াল সি ইত্যাদি। ১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে দাবি জানানোর এই ধারা চলছিল।

১৯৭১ সালে কেনিয়া প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে উপকূল থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত সমুদ্র এলাকাকে একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (ইইজেড) হিসেবে নির্ধারণের সর্বজনীন আইন প্রস্তাব করে। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ সমুদ্র বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি কনভেনশন গ্রহণে সম্মতি জানায়। শেষ পর্যন্ত ১৯৮২ সালে ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন অন দ্য ল' অব দ্য সি (আনক্লস-থ্রি) গৃহীত হয় এবং ১৯৯৪ সালে তা বাস্তবায়িত হয়।

সমুদ্র অধিকার ও নৌ-আধিপত্যের পূর্বাপর

হিমালয়, কারাকোরাম ও হিন্দুকুশ– এই তিন পর্বতশ্রেণি অতন্দ্র প্রহরীর মতো আগলে রেখেছে ভারতবর্ষকে। আর এই বিশাল ভূখণ্ডের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অনাদিকাল থেকে প্রবহমান তিন বৃহৎ নদী পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার অববাহিকায় গড়ে ওঠা এক সমৃদ্ধ জনপদ এই বাংলা। হাজারো নদী আর বঙ্গোপসাগরের আশীর্বাদপুষ্ট এ অঞ্চলের শান্তি ও সমৃদ্ধিতে চিরকাল অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে নৌ-আধিপত্য।

'টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট, ১৯৭৪' এর সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ইতিহাস বলে, প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে সিন্ধু অববাহিকায় গড়ে ওঠা হরপ্পা সভ্যতার কালেই সমুদ্রপথে বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ ও বাণিজ্য বিস্তার ঘটে ভারতবর্ষের। প্রায় সমসাময়িক সময়ে এ অঞ্চলে নৌশক্তি চর্চারও বর্ণনা মেলে ইতিহাসের পাতায়। আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের ভারতবর্ষ আক্রমণ ও বাংলার সীমান্ত থেকে নৌবহরসমেত ফিরে যাওয়ার কথা যেমন জানা যায়, তেমনি প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে বাংলার বুকে মৌর্য, গুপ্ত, পাল ও সেন বংশের রাজত্বকালেও নৌশক্তি সুসংহতকরণ প্রতিযোগিতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের প্রারম্ভে যখন বাংলায় প্রথম মুসলিম শাসকদের আবির্ভাব ঘটে, তখন বাংলাকে স্বাধীন সালতানাত ঘোষণার পাশাপাশি উন্নত নৌশক্তির জোরে বাংলা অভিমুখী দিল্লির আগ্রাসন বারবার প্রতিহত করেছেন এই অঞ্চলের প্রতাপশালী জমিদাররা। আবার বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নেপথ্যেও রয়েছে বাংলা সালতানাত ও বারো ভুঁইয়ার নৌ-প্রতিপত্তির অবসান।

সমুদ্রপথে একের পর এক ইউরোপীয় বণিকগোষ্ঠীর আগমনে বাংলার ইতিহাস মোড় নেয় ভিন্ন দিকে। আঠারো শতকে নৌশক্তিধর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে বাংলা তথা ভারতবর্ষে শুরু হয় ইংরেজ ঔপনিবেশিক যুগ। ব্রিটিশরাজের হাত ধরে ইতিহাসের বহু পথ পাড়ি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় রয়েল ইন্ডিয়ান নেভি। ইংরেজ নিয়ন্ত্রিত এই নৌবাহিনীতে কাজ করেছে হাজার হাজার বাঙালি।

কালক্রমে অবসান ঘটে ব্রিটিশ শাসনের। ভারতবর্ষ বিভক্ত হয় ভারত ও পাকিস্তান– এই দুই দেশে। ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ ছেড়ে যাওয়ার সময় রয়েল ইন্ডিয়ান নেভি বিলুপ্ত হয়ে জন্ম নেয় ভারতীয় ও পাকিস্তান নৌবাহিনী। বৈষম্যের বেড়াজাল ভাঙতে ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে জন্ম নেয় স্বাধীন বাংলাদেশ। একই সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

বাংলাদেশ অপার সম্ভাবনাময় সম্পদের আধার সার্বভৌম একটি দেশ। এই সম্পদের বড় একটি অংশ মজুদ বাংলাদেশের দক্ষিণের সীমানা নির্ধারণকারী বঙ্গোপসাগরে। বিশাল এই জলরাশির প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের ন্যায্যতাভিত্তিক আহরণ নিশ্চিতকরণে প্রয়োজন সঠিক সমুদ্রসীমা নির্ধারণ, যে কাজে স্বাধীনতা-পরবর্তী নবীন বাংলাদেশকে বেশ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছে। এ বিষয়ে পরিষ্কার কোনো আইনি পরিকাঠামো ছিল না সে সময়। এ কারণে নিজেদের সমুদ্রাঞ্চলের ওপর সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় একটি বিশদ আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট সেই প্রয়োজনীয়তারই প্রতিফলন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন সরকার দেশের সমুদ্রসম্পদের টেকসই ব্যবহারের ওপর জোর দিয়েছে। এর সঙ্গে দেশের সমুদ্র বাণিজ্যের প্রসার তো বরাবরই সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারের বিষয়। এ দুটি বিষয়ই নিশ্চিত করতে হলে সমুদ্র নিরাপত্তার কোনো বিকল্প নেই। অন্য কোনো দেশ যেন আমাদের সমুদ্রসীমায় প্রবেশ করে সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে যেতে না পারে, সেটি নজরদারিতে রাখতে হবে। সে সাথে দেশের জলসীমায় আসা বিদেশি জাহাজগুলোর নিরাপত্তার বিষয়টিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এসব নিরাপত্তামূলক কার্যক্রমের জন্য বাংলাদেশ নৌবাহিনীসহ আইন প্রয়োগকারী অন্যান্য সংস্থা সদাতৎপর। কিন্তু নিরাপত্তা নজরদারির কার্যক্ষেত্র নির্ধারণের জন্য তো নিজেদের সমুদ্রসীমা সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে জানতে হবে। টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট সেই সমুদ্রসীমাই সংজ্ঞায়িত করেছে।

বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের জন্য কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

বিশ্বের সবচেয়ে বড় উপসাগর বঙ্গোপসাগর ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের একটি প্রধান অংশ। পাশাপাশি এটি ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের সংযোগকারী হওয়ায় আঞ্চলিক ও কৌশলগতভাবে এর গুরুত্ব অনেক। মালদ্বীপ, শ্রীলংকা, ভারত, বাংলাদেশ, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া এমনকি স্থলবেষ্টিত ভুটান ও নেপালও বাণিজ্যিকভাবে এই জলরাশির সুবিধাভোগী। বঙ্গোপসাগর শুধু একটি সাগর নয়, বরং এটি বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক ও করপোরেট স্বার্থের প্রাণভোমরা।

সাম্প্রতিক সময়ে সমুদ্র অর্থনীতির জোয়ার ও ভূরাজনৈতিক পটপরিবর্তন বাংলাদেশের জন্য বঙ্গোপসাগরের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। অর্থনৈতিক গুরুত্বের কথা চিন্তা করলে দেখা যায়, বঙ্গোপসাগর শুধু ঐশ্বর্যমণ্ডিত এক বিশাল লবণাক্ত জলরাশিই শুধু নয়, এটি ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়ায় সম্ভাবনাময় একটি অবলম্বনও। এটি জীববৈচিত্র্যপূর্ণ একটি বিশাল জলাধার। প্রবাল, মৎস্য প্রজনন অঞ্চল ও ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল এই বৈচিত্র্য আরও বাড়িয়েছে।

সামুদ্রিক জলসীমা একটি দেশের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, তা ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিলের একটি বক্তব্যেই স্পষ্ট। তিনি বলেছিলেন, যদি উন্মুক্ত সাগর ও ইউরোপ-এই দুয়ের মধ্যে যেকোনো একটিকে বেছে নিতে বলা হয়, তাহলে ব্রিটেন অবশ্যই উন্মুক্ত সাগরকেই বেছে নেবে।

আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও ভূরাজনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। এটি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত, যেখানে রয়েছে দুটি বিশাল অর্থনৈতিক জোট সার্ক ও আসিয়ান। স্বাভাবিকভাবেই এই দুই জোটের কৌশলগত

‘টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট, ১৯৭৪’ এর সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ জুড়ে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। এই জলরাশির উপকূলবর্তী দেশগুলোর সম্মিলিত জিডিপি প্রায় সাড়ে ৭ লাখ কোটি ডলার। আর সুবিধাভোগী দেশগুলো জিডিপিতে যোগ করেছে ৮১ হাজার কোটি ডলারের বেশি। এই অঞ্চলের সার্কভুক্ত দেশগুলোর আন্তঃবাণিজ্য তাদের মোট আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তুলনায় ৫ শতাংশ, আর আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর ক্ষেত্রে এ হার ২৫ শতাংশ।

সমুদ্র অর্থনীতির সম্ভাবনার কারণে বাংলাদেশের কাছে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বঙ্গোপসাগর। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের ধনী দেশগুলোর তুলনায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর করোনা-পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের গতি হবে অনেক ধীর। ফলে মহামারি-পরবর্তী বিশ্বে ধনী ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বৈষম্য অনেক বেড়ে যাবে। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর জন্যে সমুদ্রসম্পদ আহরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করাটা মহামারির ক্ষতি কাটিয়ে ওঠায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে। দেশের অর্থনীতির প্রাণভোমরা হলো তৈরি পোশাক রপ্তানি। এর মাধ্যমে বছরে ৪০ হাজার কোটি টাকার মতো আয় হয় বাংলাদেশের। এদিকে সামুদ্রিক সম্পদের মধ্যে কেবল মাছ রপ্তানি থেকেই বছরে ১০-১২ হাজার কোটি টাকা আয় করা সম্ভব। অন্যান্য সম্পদ এর সঙ্গে যোগ হলে অর্থনৈতিক সম্ভাবনা আরও বেড়ে যাবে।

অধিকার আদায়ে বাংলাদেশের বন্ধুর পথচলা

মেরিটাইম বাংলার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী নেতৃত্বের নিদর্শন হলো টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট, ১৯৭৪। এর মাধ্যমে সমুদ্রবিষয়ক আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নের আগেই নিজস্ব আইনপ্রণেতা গুটিকয়েক দেশের অন্যতম হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। এই অ্যাক্টে বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় তটরেখা থেকে ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় সমুদ্রসীমা, ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (ইইজেড) ও ৩৫০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপান অঞ্চল হিসেবে দাবি করা হয়েছে। এই দাবিকৃত অঞ্চলের অধিকার বুঝে নিতে ২০০৯ সালের জুলাই এবং ২০১০ সালের জানুয়ারি ও মার্চে মিয়ানমারের সাথে তিন দফায় বৈঠক করেও কোনো সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। এছাড়া ২০০৯ সালের মার্চ ও ২০১০ সালের জানুয়ারিতে ভারতের সাথেও সমুদ্রসীমা নিয়ে দুই দফা বৈঠক হয়। এতে কোনো স্থায়ী সমাধান ছাড়াই বাংলাদেশের দাবিগুলো উপেক্ষিত থেকে যায়। বৈঠকগুলোয় বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে আমলে নিয়ে ন্যায্যতার ভিত্তিতে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের দাবি জানায়। অন্যদিকে মিয়ানমার ও ভারত সমদূরত্বের ভিত্তিতে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের পক্ষে মত দেয়। সমুদ্রসীমা আইন এড়িয়ে দেশ দুটি বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যার বড় অংশকে নিজেদের বলে দাবি করে।

২০০১ সালের জুলাইয়ে আনক্লসের প্রতি অনুসমর্থন জানায় তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার। ওই সময় থেকে পরবর্তী ১০ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ২০১১ সালের জুলাই নাগাদ মহীসোপানের দাবি জাতিসংঘের কাছে জমা দেওয়ার নিয়ম। সে লক্ষ্যে ২০১০ সালের মার্চে প্রথমবারের মতো বঙ্গোপসাগরে প্রয়োজনীয় সিসমিক ও ব্যাথিমেট্রিক জরিপের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

ভারত ও মিয়ানমার জাতিসংঘের কাছে তাদের মহীসোপানের দাবি পেশ করার পর বাংলাদেশের স্বার্থ হুমকির মুখে পড়ে। উভয় দেশের দাবি অনুযায়ী বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকা ১৩০ নটিক্যাল মাইলের মধ্যেই অবরুদ্ধ হয়ে পড়ত এবং বাংলাদেশের দাবি করা ইইজেডের বড় অংশ দেশ দুটির নিয়ন্ত্রণে চলে যেত। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার দ্রুতগতিতে এই বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ২০০৯ সালের ৮ অক্টোবর আনক্লসের অধীনে ভারত ও মিয়ানমারকে সালিশি নিষ্পত্তির নোটিস দেয়। এই উদ্যোগ গ্রহণের পর বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যকার মামলাটি আনক্লসের আওতায় প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ট্রাইব্যুনাল ফর দ্য ল' অব দ্য সি (ইটলস) তে এবং বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার মামলাটি স্থায়ী সালিশি আদালতে (পিসিআই) প্রেরণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিয়ে ২০১২ সালের ১৪ মার্চ ইটলসের এবং বাংলাদেশ-ভারত বিরোধ নিয়ে ২০১৪ সালের ৭ জুলাই পিসিআইয়ের রায় বাংলাদেশের অনুকূলে যায়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র অঞ্চলের সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ বুঝে পায়। তিন দশকের বেশি সময়ে বিরোধ নিষ্পত্তিতে ইটলসের বিচারিক এখতিয়ার মেনে নিতে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে বিশেষ মতৈক্য হয়। এই ঐতিহাসিক রায় কেবল বাংলাদেশের অধিকারই প্রতিষ্ঠা করেনি, বরং বিশ্বসভায় বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতিকে নতুন মর্যাদার আসনে অভিষিক্ত করেছে।

২০১০ সালের মার্চে সমুদ্রসীমা নির্ধারণে বঙ্গোপসাগরে প্রথম সিসমিক ও ব্যাথিমেট্রিক জরিপ চালানো হয়

সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র অঞ্চলের সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ বুঝে পায়

‘টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট, ১৯৭৪’ এর সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে স্টল পরিদর্শন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সুবর্ণজয়ন্তী : চিরভাস্বর উদ্যোগকে স্মরণের উপলক্ষ

টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট’ ১৯৭৪ প্রণয়নের ৫০ বছর পেরিয়ে গেছে। এ উপলক্ষে ২২ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, তিন বাহিনীর প্রধান, উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা, দেশি-বিদেশি কূটনীতিক, সমুদ্র খাতের বিশেষজ্ঞ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী সেশনের পর সমুদ্রবিষয়ক সংস্থা, গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে ‘ফিফটি ইয়ারস সেলিব্রেশন অব টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট, ১৯৭৪ : সিগনিফিকেন্স অ্যান্ড ওয়ে ফরোয়ার্ড’ শীর্ষক একটি সেমিনার সেশনের আয়োজন করা হয়।

উদ্বোধনী সেশনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম নাজমুল হাসান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী। সেমিনারে মূল প্রতিপাদ্যের ওপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমুদ্রবিষয়ক ইউনিটের সচিব রিয়ার এডমিরাল (অব.) মো. খুরশীদ আলম। প্যানেল আলোচক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. লাইলুফার ইয়াসমিন ও অধ্যাপক রাশেদ উজ জামান এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রিয়ার এডমিরাল এম মুসা।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনাদর্শের একটি বিশেষ দিক ছিল সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং সমুদ্রভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এই রাজনৈতিক দর্শনের প্রকাশ বঙ্গবন্ধুর জীবৎকালে বহুবার হয়েছে। আর ৫০ বছর পরও যখন তার প্রণীত টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট সমানভাবে প্রাসঙ্গিক থাকে, তখন বোঝা যায় এটি কতটা বাস্তবভিত্তিক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিল।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্টের ৫০ বছর পূর্তির এই মাহেন্দ্রক্ষণ আমাদের আইনটির তাৎপর্যের কথা বিশেষভাবে উপলব্ধি করায়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এটি নিছক একটি আইন বা দলিল নয়, বরং একটি ভিত্তিপ্রস্তর, যা আমাদের সার্বভৌমত্বকে আরও দৃঢ় করেছে, আমাদের সামুদ্রিক সীমাকে আরও সুস্পষ্ট করেছে এবং এই অঞ্চলে আমাদের অধিকারকে সুসংহত করেছে। এই আইনের মাধ্যমে আমরা আমাদের সামুদ্রিক সম্পদ রক্ষা, সামুদ্রিক সীমানাভুক্ত এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ বৈশ্বিক মঞ্চে আমাদের অধিকার নিশ্চিত করার সক্ষমতা অর্জন করেছি।

বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং তার মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের সমুদ্র অগ্রযাত্রার বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের বিষয়ে আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট প্রণয়নের দীর্ঘ আট বছর পর ১৯৮২ সালে আনক্লস-থ্রি প্রণয়নের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সকল দেশের জন্য একটি সমন্বিত দিকনির্দেশনামূলক বিধি প্রণয়ন করে। তবে আনক্লস-থ্রি প্রণয়নের পর বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণের জন্য তৎকালীন সরকারসমূহ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সমুদ্রসীমা ভাগাভাগি বিষয়ে অস্পষ্টতা ছিল। পরবর্তীতে বর্তমান সরকার বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির আলোকে বন্ধুত্বপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা সম্পর্কিত অস্পষ্টতা দূরীভূত করে। আমরা অসংখ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি এবং সফলভাবে মোকাবিলাও করেছি। এর ফলস্বরূপ ২০১২ ও ২০১৪ সালে বাংলাদেশ যথাক্রমে মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সামুদ্রিক সীমানা নিষ্পত্তি করে।

প্যানেল সেশনে আলোচকরা বলেন, বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের তৃতীয় প্রতিবেশী। সমুদ্রপথে দক্ষিণ এশিয়ার গেটওয়ে হয়ে ওঠার সব সম্ভাবনা রয়েছে বাংলাদেশের। সমুদ্র বিজয়ের পর আমাদের জন্য সুযোগ এসেছে সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা পুরোপুরি কাজে লাগানোর। সমুদ্র বাণিজ্য, বন্দর ব্যবস্থাপনা, মৎস্য ও খনিজ সম্পদ আহরণ, ট্রান্সশিপমেন্ট-ট্রানজিট সেবা, অফশোর প্রকল্প ইত্যাদি বাংলাদেশের সুনীল অর্থনৈতিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হয়ে উঠতে পারে।

আলোচকরা সুনীল অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে টেকসই করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমুদ্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেন। তারা আরও বলেন, এই যে আমরা বঙ্গোপসাগরে আমাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে পরিকল্পনা সাজাতে পারছি, তার নেপথ্যে সবচেয়ে বড় অবদান রয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী উদ্যোগ টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্টের। আইনটির সুবর্ণজয়ন্তীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমাদের সমুদ্র সার্বভৌমত্বের সুরক্ষা ও সুনীল অর্থনীতির সুরক্ষায় আরও বেশি প্রত্যয়ী হওয়ার শপথ গ্রহণ করতে হবে।

উপসংহার

টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট বাংলাদেশের নিজস্ব জলসীমায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার আইনি কাঠামো তৈরি করে দিয়েছে। সামুদ্রিক কর্মকাণ্ড নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যপরিধির একটি রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে এই অ্যাক্টে। দেশের সমুদ্র খাতে প্রযুক্তি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে দীর্ঘমেয়াদি সমুদ্রনীতি প্রণয়ণের জন্য যে মৌলিক ভিত্তি অনিবার্য ছিল, অ্যাক্টটি সেই ভিত্তি দিয়েছে। এছাড়া মেরিটাইম খাতে যেকোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও সম্ভাবনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আইনগত ভিত্তিও প্রতিষ্ঠিত করেছে এই অ্যাক্ট।

দেশের সমুদ্র স্বার্থের সুরক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রভাব জোরদারের সুযোগ করে দিয়েছে টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট। ইইজেড ও মহীসোপান অঞ্চলে মৎস্য আহরণ ও সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সুবিধাদি আদায়ে দিয়েছে পথনির্দেশনা। জাতির পিতার দূরদর্শী নেতৃত্বে পাঁচ দশক আগে প্রণীত এই অ্যাক্টের প্রাসঙ্গিকতা এখনো বিদ্যমান। এটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও বৈশ্বিকভাবে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান তৈরিতে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছে। আন্তর্জাতিক আদালতে রায়ের মাধ্যমে ২০১২ সালে মিয়ানমার ও ২০১৪ সালে ভারতের সঙ্গে সমুদ্র বিজয়ের নেপথ্য শক্তি ছিল বঙ্গবন্ধুর টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী নেতৃত্ব। এই বিজয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্থলভাগের বাইরে জলসীমাতেও আরেক বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে।

কনটেইনার জাহাজের আদ্যোপান্ত

বন্দরবার্তা ডেস্ক

ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে মানুষ ঠিক কবে থেকে সাগরকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে তা বলা মুশকিল। তবে মানবসভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই পণ্য পরিবহন ও যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে সমুদ্রপথের ব্যবহার বহুল প্রচলিত। ইতিহাস ঘেঁটে খ্রিস্টের জন্মেরও সাত হাজার বছর আগে অর্থাৎ নব্যপ্রস্তর যুগে ইউরোপীয় নাবিকদের এজিয়ান সাগরে নৌবাণিজ্য পরিচালনার হদিস মিলেছে। স্থলপথের চেয়ে জলপথে পণ্য পরিবহন নিরাপদ, দ্রুত ও সাশ্রয়ী হওয়ায় খ্রিস্টপূর্ব তিন শতাব্দীতে বণিকেরা সমুদ্রবাণিজ্যে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। প্রাচীনকালে গাছের গুঁড়ির সাথে পণ্য বেঁধে উপকূলের ধার ঘেঁষে সেগুলোকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করা হতো। কালের পরিক্রমায় পণ্য পরিবহন পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। প্রযুক্তির অগ্রগতি ও অভিনব উপকরণের ব্যবহার বাণিজ্যপথের দূরত্ব ও পণ্যের পরিমাণ বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। উপকূল ছেড়ে সাগর মহাসাগরের গণ্ডি অতিক্রম করেছে নৌবাণিজ্য। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ৮০ শতাংশের বেশি সমুদ্রপথে পরিবাহিত হয়। স্বল্প সময়ে নিরাপদে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পণ্য পরিবহনের মূল কারিগর কনটেইনার জাহাজ। কনটেইনার শিপিংয়ের বিবর্তন পণ্য পরিবহন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে আরও দক্ষ, সাশ্রয়ী ও সহজ করে তুলেছে।

কনটেইনার শিপিংয়ের গোড়ার কথা

বর্তমানে ৬ হাজার কনটেইনার জাহাজের বিশাল বাণিজ্যিক নৌবহর প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে আনুমানিক ২২ কোটি ৬০ লাখ কনটেইনার পরিবহন করে। মাত্র তিন শতাব্দী আগেও পণ্য পরিবহন ব্যবস্থা এতটা সংগঠিত ছিল না। কনটেইনারাইজেশন প্রক্রিয়ার আগে কাঠের বাক্স, পিপে ও বস্তায় করে ব্রেক বাল্ক কার্গো হিসেবে পণ্য পরিবহন করা হতো। এর ফলে জাহাজের ডেক বা খোলের সংকীর্ণ জায়গায় পণ্য লোডিং, অফ-লোডিংয়ে শিপিং কোম্পানিগুলোকে অতিরিক্ত শ্রম, সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হতো। যান্ত্রিক সহায়তা ছাড়া পণ্য ওঠা-নামা করা হতো বলে পণ্যবাহী জাহাজগুলো সে সময় সাগরের চেয়ে বেশি সময় বন্দরেই অতিবাহিত করত। অনিরাপদ পরিবহন ব্যবস্থার দরুন তখন দুর্ঘটনা ও চুরির ঝুঁকিও ছিল বেশি। অক্ষত অবস্থায় খাদ্যদ্রব্য পরিবহন করতে শিপারদের সবচেয়ে বেশি বেগ পোহাতে হতো। নানাবিধ প্রতিকূলতা এড়িয়ে সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহনে ব্যয় করতে হতো পণ্যমূল্যের ১৫ থেকে ২০ শতাংশ।

১৮ শতকের শেষদিকে ইংল্যান্ডের কয়লা খনিগুলোকে ঘিরে সর্বপ্রথম কনটেইনারাইজেশনের উৎপত্তি ঘটে। ওরসলে ডেলফ থেকে ম্যানচেস্টারে কয়লা বহনের জন্য ১৭৬৬ সালে বক্স জাহাজ 'স্টারভেশনারের' নকশা করেন জেমস ব্রিন্ডলে। স্টারভেশনার দশটি কাঠের কনটেইনার বহন করতে পারত। পরবর্তীতে ওয়াগনকে কনটেইনার হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ১৭৯৫ সালে লিটল ইটন গ্যাংওয়ে চালু করেন বেঞ্জামিন ওট্রাম। ঘোড়ায় টানা সেসব ওয়াগনকে সহজেই ডারবি ক্যানেলের বার্জে স্থানান্তর করা যেত, যা কনটেইনারের কাজ করত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত কনটেইনারবাহী জাহাজ সাধারণত বিলাসবহুল যাত্রীবাহী ট্রেনের মালপত্র বহনের কাজে ব্যবহার হতো। ১৯৩১ সালে বিশ্বের প্রথম কনটেইনারবাহী জাহাজ অটোক্যারিয়ার চালু করে যুক্তরাজ্যের সাউদার্ন রেলওয়ে। কনটেইনার বহনের

জন্য অটোক্যারিয়ারে ২১টি স্লট দেওয়া ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তেলবাহী ট্যাংকারগুলোকে কনটেইনার জাহাজে রূপান্তর করা হয়। পরবর্তীতে কনটেইনার বহনের উদ্দেশ্যে নির্মিত প্রথম জাহাজগুলো যুক্তরাজ্য ও নেদারল্যান্ডস এবং ১৯৫১ সাল থেকে ডেনমার্কে কার্যক্রম শুরু করে। একই বছর যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটল, ওয়াশিংটন ও আলাস্কায় এ ধরনের জাহাজগুলো কনটেইনার বহনের কাজ শুরু করে।

অধিকাংশ কনটেইনারের ধারণাক্ষমতা অত্যন্ত কম থাকায় এই ধরনের জাহাজগুলো তখন তেমন সাফল্যের মুখ দেখেনি। সে সময় ৫২ শতাংশ কনটেইনারের আয়তন ছিল ৩ ঘনমিটারের চেয়েও কম। এছাড়া ইউরোপের কাঠের তৈরি কনটেইনারগুলোতে ত্রিপলের ঢাকনা ব্যবহার করায় রেল বা ট্রাকে লোডিংয়ের সময় অতিরিক্ত সরঞ্জামের প্রয়োজন পড়ত। এতে করে পণ্য পরিবহন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হতো। ফ্যাক্টরি থেকে গন্তব্যে পৌঁছার উপযোগী ইন্টারমোডাল কনটেইনার নির্মাণের মাধ্যমে এ সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে ওঠে শিপিং খাত।

বাংলাদেশে কনটেইনার শিপিংয়ের ইতিবৃত্ত

বদ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত বাংলার নৌবাণিজ্য প্রাচীনকাল থেকেই বেশ সমৃদ্ধ। কর্ণফুলীর তীরবর্তী চট্টগ্রামে এই অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যিক বন্দর অবস্থিত। আরব-পর্তুগিজ-ওলন্দাজ বণিকদের পর ব্রিটিশ আমলে ইউরোপীদের সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেন পরিচালনা করে চট্টগ্রাম। বন্দরটি সে সময় পোর্তে গ্রান্দে বা গ্র্যান্ড পোর্ট নামে সুপরিচিত ছিল। কালের পরিক্রমায় বন্দরের কাজের পরিধি বিস্তৃত হয়। দেশ স্বাধীনের পর চট্টগ্রাম বন্দরকে আন্তর্জাতিক বন্দরে পরিণত করার লক্ষ্যে মনোনিবেশ করে বাংলাদেশ সরকার।

স্বাধীন বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানির প্রধান প্রবেশদ্বার চট্টগ্রাম বন্দরে শুরুর দিকে কনটেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা ছিল না বললেই চলে। ১৯৭৭ সালের ২২ মার্চ চট্টগাম বন্দর দিয়ে প্রথম কনটেইনারবাহী জাহাজ 'এসএস টেনাসিটি' এদেশে প্রবেশ করে। মাত্র ছয়টি কনটেইনার বহনকারী এ জাহাজের আগমণের পাঁচ দশকের ভেতর চট্টগ্রাম বন্দরের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ৯০ শতাংশই চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে পরিচালিত হয়। যার প্রায় পুরোটাই কনটেইনারাইজড পণ্য।

১৯৭০-এর দশকে বিশ্বজুড়ে কনটেইনার জাহাজের ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (চবক) সে সময় তিন টন ওজনবাহী পাঁচ-ছয়টি ক্রেন ব্যবহার করে পণ্য ওঠা-নামা করত। পরবর্তীতে রপ্তানি পণ্যের তালিকায় তৈরি পোশাকের অন্তর্ভুক্তিতে কনটেইনারের ব্যবহার ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। ১৯৮০-এর দশক থেকে বন্দরের অবকাঠামোগত পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়ে ওঠে চবক। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৬ সালে চিটাগাং কনটেইনার টার্মিনাল তৈরি করা হয়। দেশের প্রথম কনটেইনার টার্মিনালটিতে দুটি ডেডিকেটেড কনটেইনার জেটি রয়েছে।

সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে কনটেইনারের সংখ্যা বাড়তে থাকায় ২০০৭ সালে নিউ মুরিং কনটেইনার টার্মিনালের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। ২০২৩ সালে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে ৩০ লাখ ৫০ হাজার টিইইউ কনটেইনার পরিবহন করা হয়। গত বছর ৪ হাজার ১০৩টি পণ্যবাহী জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়েছে এবং কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের পরিমাণ প্রথমবারের মতো ১২ কোটি মেট্রিক টন ছাড়িয়ে গেছে। চলতি বছরের এপ্রিলে পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল (পিসিটি) অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করলে চট্টগ্রাম বন্দরের কর্মচাঞ্চল্য আরও বাড়বে। সৌদি আরবভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'রেড সি গেটওয়ে টার্মিনাল' ২২ বছরের জন্য চট্টগ্রাম বন্দরের তৃতীয় এই টার্মিনালটির পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে। পিসিটি চালু হলে বছরে প্রায় সাড়ে চার লাখ টিইইউ কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

চট্টগ্রামের পাশাপাশি মোংলা বন্দরের মাধ্যমেও কনটেইনার আনা-নেওয়া করছে বাংলাদেশ। পদ্মা সেতুর কল্যাণে বর্তমানে ঢাকার সবচেয়ে নিকটবর্তী বন্দরে পরিণত হয়েছে মোংলা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বন্দরটিতে ৮২৭টি বিদেশি জাহাজ আসে এবং ২৬ হাজার ৫৯০ টিইইউ কনটেইনার হ্যান্ডলিং করা হয়। মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বর্তমানে ৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। অন্যদিকে আগামী জুনে আনুষ্ঠানিকভাবে পায়রা বন্দরের প্রথম টার্মিনাল চালু হলে বন্দরে একসঙ্গে তিনটি জাহাজ ভিড়তে পারবে। এছাড়া চট্টগ্রাম বন্দরের বে-টার্মিনাল এবং কক্সবাজারের মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হলে বিশাল আকারের কনটেইনার জাহাজ দেশে প্রবেশ করবে, যা কনটেইনারজাত পণ্যের আমদানি-রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সময়ের সাথে সাথে দেশীয় বন্দরগুলো কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ে দক্ষ হয়ে উঠলেও পণ্য পরিবহনে বিদেশি কনটেইনার জাহাজই একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করছে। একসময় বেসরকারি খাতে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজে কনটেইনার পরিবহন করত দেশীয় প্রতিষ্ঠান এইচআরসি শিপিং কোম্পানি ও কিউসি কনটেইনার লাইন। প্রতিষ্ঠান দুটি ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৮ সালের ভেতর শিপিং ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়। পণ্য পরিবহনে এইচআরসি শিপিং কোম্পানি মালিকানাধীন ১০টি জাহাজ এবং কিউসি কনটেইনার লাইন মালিকানাধীন ৭টি জাহাজ ব্যবহার করত। তবে ২০০৭ সালে কিউসি কনটেইনার লাইন এবং ২০১০ সালে এইচআরসি শিপিং কোম্পানি ব্যবসা গুটিয়ে নিলে দেশের কনটেইনার শিপিং আবারও বিদেশি জাহাজের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

দীর্ঘ দশ বছরের খরা কাটিয়ে ২০২০ সালে আবারও সাগরে ভাসে বাংলাদেশি মালিকানাধীন কনটেইনার জাহাজ। দুটি নিবন্ধিত জাহাজ নিয়ে সেই বছর কনটেইনার শিপিং শুরু করে কর্ণফুলী লিমিটেডের মালিকানাধীন এইচআর লাইনস। ব্যবসা শুরুর আড়াই বছরের মাথায় ছয়টি জাহাজ নিয়ে এইচআর লাইনস দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষ কনটেইনার জাহাজ কোম্পানিতে পরিণত হয়। তথ্য বিশ্লেষক ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান আলফালাইনারের তথ্যমতে, ২০২৩ সালের শুরুতে বিশ্বের শীর্ষ ১০০টি কনটেইনার জাহাজ অপারেটরের ভেতর এইচআর লাইনসের অবস্থান ছিল ৭৪তম। প্রতিষ্ঠানটির বহরে আরও দুটি জাহাজ সংযুক্তির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। জাহাজ দুটি কার্যক্রম শুরু করলে এইচআর লাইনসের সক্ষমতা বেড়ে ১১ হাজার ৮৪০ টিইইউয়ে উন্নীত হবে।

ইন্টারমোডাল শিপিং কনটেইনার

ম্যাকলিন ট্রাকিং কোম্পানির মালিক মার্কিন ব্যবসায়ী ম্যালকম ম্যাকলিন* বহু বছর ধরে দ্রুত ও দক্ষতার সাথে সম্পূর্ণ কার্গো ট্রাক থেকে জাহাজে লোড করার উপায় খুঁজছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৬ সালে ইন্টারমোডাল শিপিং কনটেইনার বা ফ্রেইট কনটেইনার আবিষ্কার করেন তিনি। তার এই যুগান্তকারী আবিষ্কার বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আন্তর্জাতিক পণ্য পরিবহনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধন করে। ইন্টারমোডাল শিপিং কনটেইনারের সাহায্যে আনলোড বা পুনরায় লোড করার ঝামেলা ছাড়াই ট্রাক, রেল, জাহাজসহ যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমে একবারে পণ্য পরিবহন করা যায়। এতে করে শিপিং কোম্পানিগুলোর শ্রম, অর্থ ও খরচ যেমন সাশ্রয় হয় তেমনি পণ্যগুলো নিরাপদে, অক্ষত অবস্থায় গন্তব্যে পৌঁছে যায়।

কনটেইনার পরিমাপের একক

বিশ্বব্যাপী পণ্য পরিবহনকে সহজ ও গতিশীল করে তুলতে কনটেইনারের আকারকে দুটি সাধারণ এককে পরিমাপ হয়। প্রমাণ আকারের কনটেইনারের ব্যবহার ইন্টারমোডাল ট্রান্সপোর্টেশনে সহায়ক ভূমিকা রাখে। প্রথমত, নির্দিষ্ট আকারের কনটেইনার হওয়ার কারণে তা জাহাজে সারিবদ্ধ অবস্থায় রাখা সহজ হয়। তাছাড়া প্রমাণ একক ব্যবহারের ফলে জাহাজে কতগুলো কনটেইনার লোড করা হলো সেই হিসাব রাখতে সুবিধা হয়। অন্যদিকে নির্দিষ্ট আকারের কনটেইনার হওয়ায় সেগুলো সড়ক বা রেলপথে পরিবহনের উপযোগী ক্যারিয়ার তৈরি করাও সহজ হয়। ভিন্ন ভিন্ন আকারের কনটেইনার ব্যবহার করলে সড়ক বা রেলপথের ক্যারিয়ারগুলোর আকারও ভিন্ন হতো। এতে পণ্য লোডিং, আন-লোডিংয়ে অতিরিক্ত অর্থ, শ্রম ও সময় ব্যয় হতো।

টোয়েন্টি-ফুট ইকুইভ্যালেন্ট ইউনিট (টিইইউ)

টোয়েন্টি-ফুট ইকুইভ্যালেন্ট ইউনিট বা টিইইউ হলো কনটেইনার পরিবহনের একটি প্রমাণ ইউনিট। ২০ ফুট দীর্ঘ ধাতব ইন্টারমোডাল কনটেইনারগুলোই টিইইউ নামে পরিচিত। তবে এ ধরনের কনটেইনারগুলোর উচ্চতার কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। কনটেইনারগুলোর উচ্চতা সাধারণত ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি থেকে ৯ ফুট ৬ ইঞ্চির মধ্যে হয়। তবে ৮ ফুট ৬ ইঞ্চি উচ্চতার কনটেইনার সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। উচ্চতায় ভিন্নতা দেখা গেলে এ ধরনের কনটেইনার প্রস্থে ৮ ফুট হয়ে থাকে।

ফরটি-ফুট ইকুইভ্যালেন্ট ইউনিট (এফইইউ)

কনটেইনারের আরেকটি স্ট্যান্ডার্ড সাইজ হলো ৪০ ফুট দৈর্ঘ্য। দৈর্ঘ্যে দ্বিগুণ হলেও এগুলোর প্রস্থ টিইইউর সমান হয়। এই আকারের কনটেইনারগুলোকে ফরটি-ফুট ইকুইভ্যালেন্ট ইউনিট বা এফইইউ একক দিয়ে প্রকাশ করা হয়। সাধারণত

**বন্দর বিচিত্রার মেরিটাইম ব্যক্তিত্ব অংশে ম্যালকম ম্যাকলিন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে।*

একটি এফইইউ কনটেইনারকে দুটি টিইইউ কনটেইনারের সমান ধরা হয়।

জাহাজের রকমফের

গত আড়াইশ বছরে কনটেইনারের সাইজের সাথে পাল্লা দিয়ে কনটেইনারবাহী জাহাজের আকার-আয়তনেও নানাবিধ পরিবর্তন এসেছে। বিশ্বায়নের এই যুগে কনটেইনার জাহাজগুলো ক্রমেই দানবাকৃতি ধারণ করছে। সাইজের ভিত্তিতে কনটেইনার জাহাজকে সাতটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে।

স্মল ফিডার

সবচেয়ে ক্ষুদ্রাকৃতির কনটেইনার জাহাজগুলো স্মল ফিডার ক্যাটাগরির আওতাভুক্ত। এ ধরনের জাহাজের ধারণক্ষমতা সর্বোচ্চ ১ হাজার টিইইউ। এসব জাহাজ সাধারণত ছোট বন্দর থেকে স্বল্প পরিমাণ কার্গো ট্রান্সশিপমেন্ট হাবে মাদার শিপে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করে।

ফিডার

১ হাজার থেকে ২ হাজার টিইইউ ধারণক্ষমতা সম্পন্ন মাঝারি-আকৃতির ফ্রেইট শিপগুলো ফিডার নামে পরিচিত। স্মল ফিডারের মতো এ ধরনের জাহাজও অগভীর বা অভ্যন্তরীণ বন্দরের সঙ্গে বৃহদাকৃতির জাহাজের সংযোগ স্থাপন করে। বড় জাহাজ হ্যান্ডলিংয়ের সক্ষমতা নেই এমন বন্দর থেকে কার্গো সংগ্রহ করে মাদার শিপে পৌঁছে দেওয়াই ফিডারের কাজ। এ ধরনের জাহাজ দক্ষতার সাথে কনটেইনার লোডিং আনলোডিং করতে সক্ষম। যা একই সাথে বন্দরের কাজের গতি বাড়ায় এবং কনটেইনার পরিবহন দ্রুততর করে। স্বল্প দূরত্বে কার্যক্রম পরিচালনায় পারদর্শী কোম্পানিগুলোই সাধারণত ফিডার পরিচালনা করে।

ফিডারম্যাক্স

গড়ে ১৭০ থেকে ২০০ মিটার দীর্ঘ এবং ২ থেকে ৩ হাজার টিইইউ ধারণক্ষমতা সম্পন্ন কনটেইনার জাহাজগুলো ফিডারম্যাক্স নামে পরিচিত। সংকীর্ণ প্রণালী এবং অগভীর জলপথে অধিক পরিমাণ কার্গো বহনের কাজে এ ধরনের জাহাজ ব্যবহার হয়। ফিডার ক্যাটাগরির সব জাহাজই সাধারণত কার্গো ক্রেন বহন করে থাকে।

পানাম্যাক্স

পানামা খাল বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বাণিজ্যপথ। মানবসৃষ্ট এই পথটি লক সিস্টেম ব্যবহার করে দুটি ভিন্ন উচ্চতায় থাকা আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করেছে। ৮২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই খাল অতিক্রম করতে পণ্যবাহী জাহাজগুলোকে একাধিক জল-কপাট পার হতে হয়। পানামা খাল কর্তৃপক্ষ (পিসিএ) অতিক্রমযোগ্য জাহাজের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি ও জাহাজের ড্রাফটের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেসব জাহাজ পানামা খাল অতিক্রম করতে সক্ষম সেগুলোই পানাম্যাক্স ও নিওপানামাক্স ক্যাটাগরিভুক্ত। সর্বোচ্চ ১৩ দশমিক ৩ মিটার ড্রাফটের পানাম্যাক্স জাহাজের দৈর্ঘ্য ৯৬৫ ফুট এবং প্রস্থ ১০৬ ফুট হয়ে থাকে। এ ধরনের জাহাজ ৩ হাজার থেকে ৫ হাজার ১০০ টিইইউ কনটেইনার বহন করতে সক্ষম।

পোস্ট-পানাম্যাক্স

বর্তমান সময়ে নৌপথে পণ্য পরিবহনে বিশাল আকারের জাহাজের ব্যবহার অনেক বেড়েছে। অত্যাধুনিক যেসব সুপারট্যাংকার বা কনটেইনার জাহাজ মূল পানামা খালের লকগুলো অতিক্রম করতে পারে না, সেগুলোকেই পোস্ট-পানাম্যাক্স বা ওভার-পানাম্যাক্স ক্যাটাগরিভুক্ত করা হয়েছে। এ ধরনের জাহাজ ৫ হাজার ১০০ থেকে ১০ হাজার টিইইউ কনটেইনার বহন করতে পারে।

নিওপানাম্যাক্স

সময়ের সাথে সাথে পানামা খালের ব্যবহার ক্রমেই বাড়ছে। অতিরিক্ত জাহাজের চাপ সামাল দিতে পানামা খাল সম্প্রসারণ করেছে কর্তৃপক্ষ। বৃহদাকার জাহাজ চলাচলের সুবিধার জন্য ২০১৬ সালে নতুন লকগুলো খুলে দেয় পিসিএ। পানামা খালের বর্ধিত অংশ দিয়ে চলাচলের উপযোগী জাহাজগুলো নিওপানাম্যাক্স নামে পরিচিত। ১৫ দশমিক ২ মিটার ড্রাফটের নিওপানাম্যাক্স জাহাজগুলো ১২০০ ফুট দীর্ঘ এবং ১৬০ দশমিক ৭ ফুট প্রশস্ত হয়ে থাকে। দানবাকৃতির এসব জাহাজ ১০ হাজার থেকে সাড়ে ১৪ হাজার টিইইউ ধারণক্ষমতা সম্পন্ন।

আল্ট্রা-লার্জ

বিগত তিন দশকে বিশ্বজুড়ে বাণিজ্যিক নৌবহরে বিশাল আকারের জাহাজ যুক্ত করার প্রবণতা বেড়েছে। অতিকায় আকৃতির এসব জাহাজ আল্ট্রা লার্জ কনটেইনার ভেসেল (ইউএলসিভি) ক্যাটাগরিভুক্ত। ১৫ দশমিক ২ মিটার বা তার চেয়েও গভীর ড্রাফটের এসব জাহাজ ১২০০ ফুট দীর্ঘ ও ১৬০ ফুটের বেশি প্রশস্ত হয়ে থাকে। ইউএলসিভির ধারণক্ষমতা সাড়ে ১৪ হাজার টিইইউরও অধিক। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বহরে ২৪ হাজার টিইইউর অতিকায় জাহাজ যুক্ত করছে মায়েরস্ক, ওয়ান, ওওসিএলের মতো শীর্ষস্থানীয় শিপিং কোম্পানিগুলো।

পণ্য পরিবহনের নিয়ম-নীতি

নিরাপদে পণ্য পরিবহন করাই কনটেইনারবাহী জাহাজের প্রধান কাজ। পণ্যকে অক্ষত অবস্থায় গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পণ্য পরিবহনকারীকে বেশকিছু নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হয়।

কনটেইনার প্যাকিং

শিপিং কোম্পানিগুলো দুভাবে কনটেইনারে পণ্য লোড করে থাকে।

ফুল কনটেইনার লোড (এফএলসি)

এই ধরনের শিপমেন্টে একটি কনটেইনারের সমস্ত জায়গা জুড়ে একটি কার্গোই বহন করা হয়। এক্ষেত্রে কনটেইনারে থাকা কার্গো শিপারের মালিকানাধীন থাকে অর্থাৎ শিপার অন্য কারো সাথে কনটেইনারের জায়গা ভাগাভাগি করে নেয় না। এফএলসির ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার কোম্পানিগুলো কনটেইনার ইজারা দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় শিপারের কাছে খালি কনটেইনার পাঠানো হয়। শিপার নিজ দায়িত্বে পণ্য লোড করে ক্যারিয়ার কোম্পানির দেওয়া সিল লাগিয়ে কনটেইনার বন্দরে পৌঁছে দেয়। ক্যারিয়ার কোম্পানি পরবর্তীতে জাহাজে কনটেইনার লোড করে গন্তব্যে নিয়ে যায়। এক্ষেত্রে গন্তব্যে পৌঁছানোর পরও পণ্য অক্ষত থাকার নিশ্চয়তা প্রদান করার দায়িত্ব শিপারের।

লেস দ্যান ফুল কনটেইনার লোড (এলসিএল)

পরিবহনকৃত পণ্যের পরিমাণ যখন কনটেইনারের চেয়ে কম হয় তখন শিপার এলসিএল পন্থা অবলম্বন করে। এই পদ্ধতিতে শিপার অন্যান্য ছোট কার্গোর সঙ্গে মিলিতভাবে একটি কনটেইনার শেয়ার করে। একসাথে একাধিক শিপারের কার্গো বহন করা হয় বলে একে সম্মিলিত কনটেইনারও বলা হয়। এলসিএলের ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক পণ্য কনটেইনার ফ্রেইট স্টেশনে (সিএফএস) পাঠিয়ে দেয় এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীদের পণ্যের সাথে একত্রে সেটা কনটেইনারে লোড করা হয়। গন্তব্যে পৌঁছানোর পর কনটেইনারে থাকা পণ্যগুলোকে ডিক্রিপিং প্রক্রিয়ায় পৃথক করে নিজ নিজ প্রাপকের কাছে পাঠানো হয়।

কনটেইনারের সুরক্ষা নিশ্চিতে করণীয়

জাহাজের কার্গো হোল্ড ও ডেকে করে কনটেইনার বহন করা হয়। ডেকে থাকা কনটেইনারগুলোকে উত্তাল সাগর, উচ্চ তাপমাত্রা, বৈরী আবহাওয়াসহ নানাবিধ প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়। এসব কনটেইনার সাগরে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি যেমন বেশি তেমনি এতে থাকা পণ্য অক্ষত অবস্থায় গন্তব্যে পৌঁছানোও বেশ কষ্টকর। এর ফলে এসব কনটেইনার নির্মাণে তাপ নিরোধক উপাদান ব্যবহারের পাশাপাশি সুরক্ষা নিশ্চিতে ক্যারিয়ার কোম্পানিকে বেশকিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়।

○ ওজনের নির্ধারিত সীমারেখা মেনে সমস্ত কনটেইনারে পণ্য লোড করা।

○ কনটেইনারের ভেতর পণ্যের ওজন সমানভাবে বণ্টন করা।

○ ডেকের প্রতি বর্গফুটে যতটুকু ওজন বহনের অনুমোদন রয়েছে তা মেনে চলা।

○ কনটেইনারের যেকোনো এক পাশে ভারী পণ্য লোড না করা।

○ স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে কনটেইনারের নিচের দিকে ভারী পণ্য লোড করা।

○ ভারী পণ্য বাক্স বা ক্যারেটে করে কনটেইনারে লোড করা।

উপসংহার

দশটি কনটেইনারবাহী বক্স জাহাজ স্টারভেশনার থেকে ২৪ হাজার ৩৪৬ টিইইউ ধারণক্ষমতা সম্পন্ন সর্ববৃহৎ জাহাজ এমএসসি এরিনার এই দীর্ঘ যাত্রায় পণ্য পরিবহনের গতি-প্রকৃতি যেমন বদলেছে তেমনি বদলে গেছে প্রতিকূলতার ধরন। বর্তমান সময়ে এক সাথে বিপুল পরিমাণ পণ্য বহনের সুবিধা প্রদান করলেও কনটেইনার শিপিং খাতকে লড়তে হচ্ছে ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও বৈরী প্রকৃতির বিরুদ্ধে। ক্রমবর্ধমান প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে পণ্যের সাপ্লাই চেইন সমুন্নত রাখতে হলে ক্যারিয়ার কোম্পানি ও শিপারদের যথাযথ প্রস্তুতি ও প্যাকেজিং নিশ্চিত করার পাশাপাশি ইন্ডাস্ট্রির নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে।

কৃষ্ণ সাগর, লোহিত সাগর ও পানামা খাল সংকট
শিপিং খাতে দীর্ঘমেয়াদি স্থবিরতার আশঙ্কা আঙ্কটাডের

প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট আপদের কারণে লোহিত সাগর, কৃষ্ণ সাগর ও পানামা খালের মতো গুরুত্বপূর্ণ শিপিং রুটগুলো গতি হারানোর ঝুঁকিতে, যা দীর্ঘমেয়াদি মূল্যস্ফীতি, খাদ্যনিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে যাওয়া ও জ্বালানি সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার সংকট তৈরি করতে পারে। জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থা আঙ্কটাড সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে এমন সতর্কবার্তা দিয়েছে।

'নেভিগেটিং ট্রাবলড ওয়াটারস : দ্য ইম্প্যাক্ট অন গ্লোবাল ট্রেড অব ডিসরাপশন অব শিপিং রুটস ইন দ্য রেড সি, দ্য ব্ল্যাক সি অ্যান্ড দ্য পানামা ক্যানেল' শীর্ষক এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আগে থেকেই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে কৃষ্ণ সাগর। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরুর পর তো জাহাজ চলাচল বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। জাতিসংঘ ও তুরস্কের মধ্যস্থতায় মানবিক করিডোর চালুর পর পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও এক বছরের মাথায় রাশিয়া চুক্তি থেকে সরে আসায় আবার অনিরাপদ হয়ে উঠেছে খাদ্যশস্য পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ এই শিপিং রুট।

এমন পরিস্থিতির মধ্যেই সমুদ্র পরিবহন খাতের সংকট আরও বাড়িয়ে দিয়েছে লোহিত সাগরের অস্থিরতা। ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহী কর্তৃক একের পর এক বাণিজ্যিক জাহাজে আক্রমণ বৈশ্বিক বাণিজ্য ও সাপ্লাই চেইনের অংশীজনদের কপালে চিন্তার ভাঁজ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এশিয়া থেকে ইউরোপ-আমেরিকায় জ্বালানি ও নিত্যপণ্য পরিবহনের সংক্ষিপ্ততম রুট লোহিত সাগর-সুয়েজ খাল-ভূমধ্যসাগর এড়িয়ে জাহাজগুলোকে এখন আফ্রিকা হয়ে বাড়তি পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে। এতে সময় ও খরচ দুই-ই বেড়েছে, যা বৈশ্বিক সরবরাহ খাতে চাপ তৈরি করছে।

বৈশ্বিক সমুদ্র পরিবহন খাতের আরেকটি যুগান্তকারী রুট হলো পানামা খাল। আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে যুক্তকারী এই কৃত্রিম খাল আমেরিকার পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের মধ্যে দূরত্ব কমিয়েছে প্রায় ৮ হাজার নটিক্যাল মাইল। খরার কারণে পানির স্তর নেমে যাওয়ায় গত বছর থেকেই ভুগতে হচ্ছে জলপথটিকে। খাল দিয়ে দৈনিক জাহাজ চলাচলের সংখ্যা কয়েক দফায় কমাতে বাধ্য হয়েছে কর্তৃপক্ষ। আঙ্কটাডের হিসাব অনুযায়ী, খালটি দিয়ে জাহাজ চলাচলের সংখ্যা সর্বোচ্চ অবস্থানের তুলনায় ৪২ শতাংশ কমেছে। খাল পাড়ি দেওয়ার জন্য দুই পাশে বিপুল সংখ্যক জাহাজকে অপেক্ষমাণ থাকতে হচ্ছে। ফলে নামকরা শিপিং কোম্পানিগুলো আপাতত এই খালকে এড়িয়ে চলাই শ্রেয় মনে করছে।

যুদ্ধ-ঝুঁকির প্রিমিয়াম ৯০০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে : আঙ্কটাড

লোহিত সাগরে ইয়েমেনের হুতি বিরোধীদের বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার কারণে শিপিং খাতে ওয়ার-রিস্ক ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম ৯০০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে গিয়ে থাকতে পারে। সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ কথা জানিয়েছে জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থা আঙ্কটাড।

কিছু সূত্রের বরাত দিয়ে আঙ্কটাড জানিয়েছে, গত বছরের শেষের সপ্তাহগুলোয় যেখানে ওয়ার রিস্ক প্রিমিয়াম জাহাজের মূল্যের শূন্য দশমিক ১ শতাংশের নিচে ছিল, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারির শুরুতে তা ১ শতাংশ পর্যন্ত উঠে গেছে।

সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব মেরিন ইন্স্যুরেন্স (আইইউএমআই) জানিয়েছে, লোহিত সাগর ও কৃষ্ণ সাগর এলাকায় বীমা সেবা প্রদানে তাদের বেশকিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। তারপরও তারা এই দুই অঞ্চলে জাহাজ ও বাণিজ্য পরিচালনায় বীমা সুবিধা চালু রেখেছে।

মেরিন ফুয়েল হিসেবে অ্যামোনিয়া ব্যবহারের নেতিবাচক প্রভাব দেখছেন গবেষকরা

সমুদ্র পরিবহন খাতে সবুজ রূপান্তরের অংশ হিসেবে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে গ্রিন অ্যামোনিয়া ব্যবহারের বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে অনেকদিন ধরে। গত বছর ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি ডিএনভির এক জরিপে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে জনপ্রিয়তার দিক থেকে এলএনজি ও মিথানলের পর তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে অ্যামোনিয়া। তবে সুইডেনের একদল গবেষক বলছেন, মেরিন ফুয়েল হিসেবে অ্যামোনিয়া ব্যবহারে পরিবেশের ওপর কিছু নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

সুইডেনের চ্যালমার্স ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির গবেষকরা সম্প্রতি ব্যাটারির জীবনচক্র ও তিনটি ইলেকট্রোফুয়েল নিয়ে পর্যালোচনা করেন। এই তিনটি ইলেকট্রোফুয়েলের মধ্যে অ্যামোনিয়াও রয়েছে। গবেষকরা দেখেছেন, অ্যামোনিয়া ইউট্রোফিকেশন, অ্যাসিডিফিকেশন ও লাফিং গ্যাস হিসেবে পরিচিত এক ধরনের গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

ক্রুড ট্যাংকার নির্মাণ খাতে সুদিন, নির্মাণ ব্যয় বেড়েছে ৫০ শতাংশ

বিঘ্নিত বাণিজ্য, শিপইয়ার্ডগুলোর শিডিউল না পাওয়া, চাহিদার তুলনায় নতুন জাহাজ সরবরাহে ঘাটতি ইত্যাদি কারণে ক্রুড ট্যাংকারের দাম বেড়ে গেছে। ফলে ট্যাংকার মার্কেট শিপইয়ার্ডগুলোর জন্য অত্যন্ত লাভজনক খাত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এথেন্সভিত্তিক শিপব্রোকার এক্সক্লুসিভের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে নতুন ভেরি লার্জ ক্রুড ক্যারিয়ার (ভিএলসিসি) নির্মাণের ব্যয় ২০২০ সালের তুলনায় প্রায় ৫০ শতাংশ বেড়ে গেছে।

ট্যাংকারের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার পেছনে ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বড় ভূমিকা রয়েছে। পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে রাশিয়ার ট্যাংকারগুলো ইউরোপীয় জ্বালানির বাজারে প্রবেশাধিকার হারিয়েছে। ফলে ইউরোপে জ্বালানি পরিবহনের জন্য নতুন ট্যাংকারের প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়েছে। এছাড়া হুতি বিদ্রোহীদের কারণে

সংবাদ সংক্ষেপ

স্ক্রাবার ব্যবহারে ১ হাজার ৩০০ কোটি ডলার সাশ্রয়

জাহাজের এগজস্ট গ্যাস ক্লিনিং সিস্টেমস (ইজিসিএস) বা স্ক্রাবারস ব্যবহারের ফলে ১ হাজার ৩০০ কোটি ডলার মূল্যমানের জ্বালানি সাশ্রয় হয়েছে। সি-ইন্টেলিজেন্সের সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে এই তথ্য দেওয়া হয়েছে। স্ক্রাবারস ব্যবহারের ফলে শিপিং লাইনগুলো উচ্চমাত্রায় সালফারযুক্ত জ্বালানি তেল ব্যবহার করতে পারে, যেগুলো দামেও অনেক সাশ্রয়ী। সি-ইন্টেলিজেন্স বলেছে, যত বেশি জাহাজে স্ক্রাবারস ব্যবহার করা হবে, হাই-সালফার ফুয়েল অয়েল ব্যবহারের সুযোগ তত বেড়ে যাবে। জাহাজে ভেরি লো-সালফার ফুয়েল অয়েল (ভিএলএসএফও) ব্যবহার করলে খরচ অনেক বেড়ে যায়।

ইইউর নীতিমালা বাস্তবায়নে জ্বালানি সাশ্রয়ী জাহাজ পরিচালনা করতে হবে : এলআর

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) ফুয়েল ইইউ ও ইইউ ইটিএস নীতিমালা প্রতিপালনের জন্য কিছু নির্দিষ্ট রুটে জাহাজ মালিকদের কেবল তাদের সবচেয়ে বেশি জ্বালানি সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব জাহাজগুলোই পরিচালনা করা উচিত। এছাড়া যেসব জ্বালানি ও প্রযুক্তিগত কৌশলের কথা নীতিমালাগুলোয় উল্লেখ রয়েছে, সেগুলোর বাস্তবায়নও করতে হবে তাদের। সম্প্রতি নিজেদের এক প্রতিবেদনে এমন মন্তব্য করেছে লয়েড'স রেজিস্টার (এলআর)। এলআর আরও বলেছে, বাণিজ্যিক ও পরিবহনগত বিভিন্ন প্রভাবকের কারণে সব সেগমেন্টে এই ধরনের জাহাজ পরিচালনা করা সম্ভব না-ও হতে পারে।

জাহাজ ভাড়াকারীদের সুবিধার্থে দুটি নতুন কিউইএল প্রকাশ বিমকোর

বাল্টিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম কাউন্সিল (বিমকো) সম্প্রতি দুটি স্ট্যান্ডার্ড কোয়ায়েট এনজয়মেনট লেটার (কিউইএল) প্রকাশ করেছে, যেখানে কোনো জাহাজের মালিকপক্ষ ফিন্যান্সিং এগ্রিমেন্টের শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলেও সেটির ভাড়াকারী পক্ষ জাহাজটি ব্যবহার করে যেতে পারবে। শিপিং খাতে এই ধরনের কিউইএল এটাই প্রথম। কিউইএলে বলা হয়েছে, মালিক খেলাপি হলেও ভাড়াকারী জাহাজ পরিচালনা করে যেতে পারবে। তবে তাদের কিছু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলতে হবে। যেমন চার্টার চুক্তিতে উল্লেখিত ভাড়া সময়মতো পরিশোধ করে যেতে হবে।

ইউরোপের ডিজেল বাজারে সরবরাহ সংকট

বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের কারণে ইউরোপের ডিজেল বাজার বেশ খানিকটা সরবরাহ সংকটে ভুগছে। আর এ কারণে উপমহাদেশটির অর্থনৈতিক গতিশীলতাও থমকে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। ডিজেল সরবরাহে বাধাদানকারী এসব প্রভাবকের মধ্যে সমুদ্রপথে রাশিয়া থেকে জ্বালানি আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা দুই বছর ধরেই ভোগাচ্ছে ইউরোপকে। এছাড়া ওপেক প্লাসের উত্তোলন সীমিতকরণ নীতির প্রতিক্রিয়ায় ইউরোপের কিছু প্লান্ট বন্ধ ও পরিশোধন কমানো হয়েছে। এসবের সঙ্গে সম্প্রতি বাড়তি আপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজের ওপর ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের হামলা।

সংবাদ সংক্ষেপ

জানুয়ারিতে রেকর্ড ৩ লাখ টিইইউ ধারণক্ষমতার কনটেইনার জাহাজ সরবরাহ

জানুয়ারিতে শিপইয়ার্ডগুলো মোট ৩ লাখ টিইইউ ধারণক্ষমতার ৪১টি কনটেইনার জাহাজ ক্রেতাদের কাছে হস্তান্তর করেছে। এর মধ্যে আটটি জাহাজ ছিল ১৫ হাজার টিইইউর বেশি ধারণক্ষমতার। এক মাসে জাহাজ সরবরাহের এটি নতুন রেকর্ড। অবশ্য চলতি বছরের প্রথম মাসের এই চাঙ্গাভাব যে সারা বছরই অব্যাহত থাকবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আবার একেবারে খারাপও যাবে না। বছরের বাকি ১১ মাসে মোট ২৮ লাখ টিইইউ ধারণক্ষমতার কনটেইনার জাহাজ বহরে যুক্ত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

কার্বন শুল্ক নিয়ে সংশোধিত প্রস্তাব আইসিএসের

ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের (আইএমও) অধীনে একটি কার্বন এমিশন ফান্ড গঠনের বিষয়ে আগেই একটি প্রস্তাব দিয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব শিপিং (আইসিএস)। সম্প্রতি তার একটি সংশোধিত প্রস্তাব দিয়েছে সংস্থাটি। এতে আগের মতোই শুল্ক ও ভর্তুকি নীতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। কেবল কিছু বিষয়ে নতুন ধারা যোগ করা হয়েছে। আইসিএসের মতে, জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ওপর শুল্ক আরোপ এবং পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ব্যবহারে ভর্তুকি দেওয়া হলে নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ উদ্যোগে একটা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হবে।

আগামী চার বছরের মেরিটাইম এজেন্ডা নির্ধারণ করেছে আইএমও

আরও নিরাপদ, সুরক্ষিত ও পরিবেশবান্ধব সমুদ্র পরিবহন খাত গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও)। আর এর জন্য কিছু লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রাধিকারমূলক খাত নির্ধারণ করে তারা। সম্প্রতি লন্ডনে এক সংবাদ সম্মেলনে পরবর্তী চার বছরের জন্য আইএমওর লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রাধিকারের বিষয়গুলো পৃথকভাবে তুলে ধরেছেন সংস্থাটির মহাসচিব আর্সেনিও ডোমিঙ্গেজ। সংবাদ সম্মেলনে সমুদ্র পরিবহন খাতে উদ্ভূত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার ওপরও আলোকপাত করেন আইএমও মহাসচিব।

ভারত ও ইউএইর মধ্যে ট্রান্স-কন্টিনেন্টাল ট্রেড করিডোর চুক্তি

ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) সম্প্রতি ট্রান্স-কন্টিনেন্টাল ট্রেড করিডোর বিষয়ক একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের কিছু অংশের ওপর দিয়ে সমুদ্র ও রেল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইউরোপের সঙ্গে ভারতের সংযোগ স্থাপনই এই চুক্তির লক্ষ্য। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাম্প্রতিক ইউএই সফরে এই চুক্তি সম্পন্ন হয়। গত বছরের সেপ্টেম্বরে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত জি২০ সম্মেলনের সাইডলাইন বৈঠকে করিডোরটির বিষয়ে ঘোষণা দেওয়া হয়। এর রুট হবে ভারত-আরব সাগর-ইউএই-সৌদি আরব-জর্ডান-ইসরায়েল-ইউরোপ।

ট্যাংকারগুলো লোহিত সাগর এড়িয়ে উচ্চমাশা অন্তরীপ হয়ে বাড়তি পথ পাড়ি দিচ্ছে। এতে বিদ্যমান ট্যাংকারগুলোর শিডিউল বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে।

চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় কনটেইনার জাহাজের ভাড়াও বেড়েছে

লোহিত সাগর সংকটের কারণে সমুদ্রে শিডিউল রুটে কনটেইনার পরিবহনকারী লাইন অপারেটররা বেশ বিপাকে পড়েছে। হুতি বিদ্রোহীদের হামলা এড়াতে তারা লোহিত সাগর এড়িয়ে ঘোরাপথে কনটেইনার জাহাজ পরিচালনা করছে। এতে স্বাভাবিকের চেয়ে বাড়তি সময় লাগছে। এই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বাড়তি জাহাজ ভাড়া করতে চেষ্টা চালাচ্ছে লাইন অপারেটররা। আর এই চাহিদার সুযোগ নিয়ে ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছে।

এমবি শিপব্রোকারসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাহাজমালিকরা এখন লাইন অপারেটরদের সংকটের সুযোগ নিচ্ছে। তারা প্রতিটি চার্টার কন্ট্রাক্টে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, সুয়েজ খালে জাহাজ চলাচল কমে যাওয়া ও আফ্রিকা উপকূল দিয়ে ট্রাফিক বেড়ে যাওয়ার এই সময়ে কনটেইনার জাহাজের খালি বসে থাকার ঘটনা অনেক কমেছে।

পানামা খালের উন্নয়নে রেকর্ড মূলধনি বিনিয়োগের ঘোষণা

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে নাব্যতা সংকটে ভুগছে বৈশ্বিক শিপিং খাতের অন্যতম লাইফলাইন পানামা খাল। খরার কারণে পানির স্তর নেমে যাওয়ায় সেখানে ব্যাহত হচ্ছে জাহাজ চলাচল। এই সংকট থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে জলপথটির টেকসই উন্নয়নে নজর দিয়েছে পানামা ক্যানেল অথরিটি। ৮৫০ কোটি ডলারের বেশি মূলধনি বিনিয়োগে পাঁচ বছর মেয়াদি একটি প্রকল্পের ঘোষণা দিয়েছে তারা। এই অর্থের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ ব্যয় হবে পানি ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণে।

এতদিন পানামা খালে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ ছিল ৫৪০ কোটি ডলারের-খাল সম্প্রসারণ প্রকল্পে। নতুন প্রকল্পের ব্যয় সেটিকে ছাড়িয়ে যাবে বড় অংকের ব্যবধানে। পানামা খালে পানির মূল জোগানদাতা গাতুন লেক। গত বছর বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় এই লেকের পানির লেভেল অনেক কমে যায়।

জাহাজে সাজানো কনটেইনার ধসে পড়া নিয়ে গবেষণা নরওয়েজিয়ান বীমা কোম্পানির

আক্সটাডের এক হিসাব অনুযায়ী, গত বছর কনটেইনার পরিবহনের বৈশ্বিক বহর সম্প্রসারিত হয়েছে প্রায় চার শতাংশ। কনটেইনার পরিবহনের এই ঊর্ধ্বমুখিতা একটি দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়িয়ে দেয়। আর তা হলো জাহাজে সাজানো কনটেইনার ধসে পড়া ও সাগরে হারিয়ে যাওয়া। এরূপ ঘটনার সাথে আবহাওয়াগত বিষয়াদির সম্পর্ক কীরূপ, তা অনুসন্ধানে সম্প্রতি এক গবেষণা পরিচালনা করেছে নরওয়ের মেরিন ইন্স্যুরেন্স গ্রুপ গার্ড।

গবেষণায় দেখা গেছে, সাগরের ঢেউয়ের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে জাহাজে সাজানো কনটেইনার ধসে পড়ার ঝুঁকিও বেড়েছে। গত ছয় বছরের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ছোট ফিডার জাহাজের ক্ষেত্রে কনটেইনার ধসে পড়ার হার মাত্র ১ শতাংশ, যেখানে আল্ট্রা-লার্জ কনটেইনার ভেসেলের ক্ষেত্রে এ হার প্রায় ৯ শতাংশ।

লোহিত সাগর সংকটে বিলম্বের চাপ সামাল দিতে পারছে ইউরোপীয় বন্দরগুলো

আফ্রিকা উপকূল হয়ে ঘুরে যাওয়ার কারণে এশিয়া থেকে ইউরোপমুখী জাহাজগুলোর পৌঁছতে বিলম্ব হচ্ছে। আশঙ্কা করা হচ্ছিল যে এই বিলম্বের পর জাহাজগুলো ইউরোপীয় বন্দরে পৌঁছলে জট তৈরি হতে পারে। তবে বাস্তবে দেখা যাচ্ছে উত্তর ইউরোপের বন্দরগুলো এই চাপ বেশ ভালোভাবেই সামাল দিচ্ছে এবং এখন পর্যন্ত বন্দর কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রতার কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি।

এর আগে এভার গিভেন আটকে যাওয়ার ঘটনায় সুয়েজ খালে জাহাজ চলাচল ছয়দিন বন্ধ থাকায় ইউরোপমুখী জাহাজের তীব্র চাপ তৈরি হয়েছিল। এসব জাহাজ যখন ইউরোপে পৌঁছে, তখন সেগুলোকে সেবা দিতে গিয়ে বন্দরগুলোকে হিমশিম খেতে হয়েছিল,

জাহাজের মালিকানায় আধিপত্য বজায় রেখেছে জাপান, চীন ও গ্রিস

বহরে থাকা জাহাজের সংখ্যা ও সম্পত্তির মূল্য পর্যালোচনা করে সম্প্রতি জাহাজ মালিকানায় বিশ্বের শীর্ষ দশ দেশের তালিকা প্রকাশ করেছে ভেসেলভ্যালু। বরাবরের মতো জাপান, চীন ও গ্রিস তালিকার শীর্ষস্থান ধরে রাখলেও ছন্দপতন ঘটেছে জার্মানির। অন্যদিকে প্রথমবারের মতো তালিকায় স্থান করে নিয়েছে হংকং।

২০ হাজার ৬৩০ কোটি ডলারের সম্পত্তি নিয়ে তালিকায় নেতৃত্ব দিচ্ছে জাপান। ট্যাংকার খাতে ১০০টি জাহাজ যুক্ত করায় জাপানি নৌবহরের মোট মূল্য ১৫ দশমিক ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২টি এলএনজি, ৩৪৪টি এলপিজি ও ৩৩৪টি ভেহিকল ক্যারিয়ার নিয়ে এই তিন খাতে জাহাজের সংখ্যা ও সম্পদের মূল্যমানে এগিয়ে আছে জাপান।

অন্যদিকে বর্তমানে ২০ হাজার ৪০০ কোটি ডলার মূল্যমানের ৬ হাজার ৮৪টি জাহাজ নিয়ে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে চীন। ট্যাংকার ও কনটেইনার জাহাজ খাতে শীর্ষে থাকা চীন বর্তমানে ১ হাজার ৫৭৬টি ট্যাংকার এবং ১ হাজার ১১টি কনটেইনার জাহাজের মালিক। মালিকানাধীন জাহাজের সংখ্যা ও সম্পদের মূল্যের দিক দিয়ে তালিকার তৃতীয় স্থানে রয়েছে গ্রিস। বর্তমানে গ্রিক ট্যাংকার ফ্লিটের মূল্যমান ৬ হাজার ৯৫০ কোটি ডলার।

তালিকার চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থানে থাকা যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ কোরিয়ার জাহাজের মূল্যমান যথাক্রমে ৯ হাজার ৯৯০ কোটি, ৮ হাজার ৫৭০ কোটি ও ৬ হাজার ৭০০ কোটি ডলার। বহরে সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় নরওয়ে সপ্তম ও যুক্তরাজ্য অষ্টম স্থানে পৌঁছলেও তালিকায় পিছিয়েছে নবম স্থানে থাকা জার্মানি। অন্যদিকে নতুন দেশ হিসেবে শীর্ষ দশ দেশের তালিকায় যুক্ত হয়েছে হংকং।

ইটিএস কার্যকর হলে এশিয়া থেকে ১১০ কোটি ডলার ট্যাক্স পাবে ইইউ

ইউরোপীয় ইউনিয়নের এমিশন ট্রেডিং সিস্টেম (ইইউ ইটিএস) সম্পূর্ণ রূপে বাস্তবায়িত হলে ইউরোপীয় বন্দরে কার্যক্রম পরিচালনাকারী এশীয় জাহাজ মালিকদের এমিশন লায়াবিলিটি ১১০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাবে। সম্প্রতি হামবুর্গ-ভিত্তিক মেরিটাইম টেকনোলজি ফার্ম ওশানস্কোর এ তথ্য জানায়।

গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণে লাগাম টানতে ২০০৫ সালে এমিশন ট্রেডিং সিস্টেম চালু করে ইইউ। ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকে মেরিটাইম খাতকে ইইউ ইটিএসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে ইউরোপীয় বন্দরগুলোয় আসা-যাওয়া করা এবং ইউরোপের মধ্যে কার্যক্রম পরিচালনাকারী জাহাজগুলো নিঃসৃত গ্রিন হাউস গ্যাসের ৪০ শতাংশের জন্য দায়বদ্ধ থাকে। তবে সময়ের সাথে সাথে এই দায়বদ্ধতার পরিমাণ বাড়বে। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে দায়বদ্ধতার পরিমাণ ৭০ শতাংশ ও ২০২৬ সালে ১০০ শতাংশে পৌঁছবে।

চলতি বছর ইটিএস দ্বারা এশীয় পতাকাবাহী চার সহস্রাধিক জাহাজ প্রভাবিত হবে, যা ইইউ ইটিএসের আওতাভুক্ত মোট যাত্রীবাহী জাহাজ (৫ হাজার গ্রস টনের বেশি) ও সাড়ে ১২ হাজার কার্গো জাহাজের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। কসকো, এইচএমএম, অ্যাংলো-ইস্টার্ন শিপ ম্যানেজমেন্টসহ ৪ শতাধিক ডকুমেন্টস অব কমপ্লায়েন্স (ডিওসি) হোল্ডার এসব জাহাজের মালিকানা বা পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে। এমিশন ট্যাক্সের দ্বারা চীন ও সিঙ্গাপুরে নিবন্ধিত কোম্পানিগুলো সবচেয়ে প্রভাবিত হবে।

ওশানস্কোরের তথ্যমতে, চলতি বছর গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণের জন্য এশিয় জাহাজ মালিকদের ৫৪ কোটি ৩০ লাখ ডলার এমিশন ট্যাক্স প্রদান করতে হবে। তিন ধাপে ইটিএস শতভাগ বাস্তবায়িত হলে ট্যাক্সের পরিমাণ ১১০ কোটি ডলার ছাড়াবে। তবে কার্বনের দাম অস্থিতিশীল হওয়ায় ট্যাক্সের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

যার প্রভাবে বন্দর ও স্থলহাবগুলোয় ভয়ানক জট দেখা গিয়েছিল।

২০২৩ সালের চতুর্থ প্রান্তিকেও নাবিকদের প্রসন্নতা সূচক কমেছে

দ্য মিশন টু সিফেয়ারারস হ্যাপিনেস ইনডেক্স সম্প্রতি নাবিকদের প্রসন্নতার সূচক নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে দেখা গেছে, ২০২৩ সালের শেষ প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) এই সূচক কমেছে। জরিপে অংশগ্রহণকারী নাবিকরা কর্মচাপ, মজুরি আটকে থাকা, সামাজিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা, সম্মান প্রাপ্তির অভাব ইত্যাদি বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন।

প্রতিবেদনে দেখা গেছে, চতুর্থ প্রান্তিকে নাবিকদের প্রসন্নতার সূচক দাঁড়িয়েছে ৬ দশমিক ৩৬ পয়েন্ট (মোট ১০ পয়েন্টের মধ্যে)। গত বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে সূচকের মান ছিল ৬ দশমিক ৬ পয়েন্ট, দ্বিতীয় প্রান্তিকে ৬ দশমিক ৭৭ এবং প্রথম প্রান্তিকে ৭ দশমিক ১ পয়েন্ট। এর অর্থ হলো ২০২৩ সালের শুরু থেকেই নাবিকদের প্রসন্নতার সূচক ক্রমান্বয়ে কমেছে।

প্রথমার্ধে যুক্তরাষ্ট্রের খুচরা আমদানি বাড়বে : এনআরএফ

লোহিত সাগরে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের হামলার কারণে বৈশ্বিক শিপিং খাত বেশ উদ্বেগজনক অবস্থায় রয়েছে। তবে এই ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রের খুচরা আমদানিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না বলে জানিয়েছে ন্যাশনাল রিটেইল ফেডারেশন ও হ্যাকেট অ্যাসোসিয়েটস। তাদের সাম্প্রতিকতম গ্লোবাল পোর্ট ট্র্যাকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লোহিত সাগরে উত্তেজনা সত্ত্বেও চলতি বছরের প্রথমার্ধে যুক্তরাষ্ট্রে কনটেইনার আমদানি বাড়বে।

এনআরএফের ভাইস প্রেসিডেন্ট জোনাথন গোল্ড বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে মোট যে পরিমাণ খুচরা পণ্য কনটেইনারে করে আমদানি করা হয়, তার মাত্র ১২ শতাংশ সুয়েজ খাল দিয়ে পরিবহন হয়। এদিকে হ্যাকেট অ্যাসোসিয়েটসের প্রতিষ্ঠাতা বেন হ্যাকেট বলেন, আফ্রিকা উপকূল দিয়ে ঘুরে যাওয়ার জন্য যে বাড়তি সময় লাগছে, সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য জাহাজ কোম্পানিগুলো তাদের সর্বোচ্চ সক্ষমতা কাজে লাগাচ্ছে।

শিপ রিসাইক্লিংয়ে আইনগত বিভেদ দূর করার আহ্বান খাতসংশ্লিষ্টদের

বাল্টিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম কাউন্সিল (বিমকো), ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব শিপিং (আইসিএস), বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও নরওয়ে সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের (আইএমও) মেরিন এনভায়রনমেন্ট প্রটেকশন কমিটির (এমইপিসি) ৮১তম বৈঠকে একটি নথি দাখিল করেছে। এতে হংকং কনভেনশন ও ব্যাসেল কনভেনশনের মধ্যে যদি কোনো দ্বন্দ্ব থাকে, সেগুলো দূর করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

নথিতে বলা হয়েছে, এই দুই কনভেনশনের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধী কোনো বিষয় থাকলে জাহাজমালিক, শিপ রিসাইক্লিং ইয়ার্ড ও সংশ্লিষ্ট অন্য অংশীজনদের মধ্যে দ্বিধা-বিভক্তি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। উল্লেখ্য, হংকং ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দ্য সেফ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টালি সাউন্ড রিসাইক্লিং অব শিপস বা সংক্ষেপে হংকং কনভেনশন ২০২৫ সালের ২৬ জুন কার্যকর হবে।

উত্তর ইউরোপে ফিডার সার্ভিসে সবুজ প্রযুক্তির ওপর জোর

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে উত্তর ইউরোপের সমুদ্র পরিবহন খাত অনেকটা হাব অ্যান্ড স্পোক ব্যবস্থানির্ভর হয়ে পড়েছে। আর এতে ফিডার অপারেশনের চাহিদাও অনেকখানি বেড়েছে। এই চাপ সামাল দিতে অপারেটরগুলো নতুন নতুন ফিডার জাহাজ তাদের বহরে যোগ করছে। আর এক্ষেত্রে তারা গ্রিন ফিডারের ওপর জোর দিচ্ছে।

এমনই একটি অপারেটর হলো ইউনিফিডার। সম্প্রতি তারা দুটি নতুন

সংবাদ সংক্ষেপ

ডিজিটালাইজেশনে বিলম্বের অর্থ পিছিয়ে পড়া : মায়েরস্ক

সাপ্লাই চেইন-সংশ্লিষ্টদের জন্য এখন ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়ার সাথে একাত্ম হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। যত দ্রুত এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হওয়া যাবে, অন্যদের চেয়ে তত বেশি এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। শিপিং জায়ান্ট মায়েরস্ক সম্প্রতি এ কথা বলেছে। এদিকে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট খাতের জ্যেষ্ঠ নির্বাহীদের নিয়ে একটি জরিপ পরিচালনা করেছে ইকোনমিস্ট ইম্প্যাক্ট, যার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাপ্লাই চেইন খাতকে ডিজিটালাইজ করার ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি বেশকিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে বটে, তবে এটি থেকে উপকার পাওয়া যাবে দীর্ঘমেয়াদি।

ওশান অ্যালায়েন্সের মেয়াদ আরও পাঁচ বছর বাড়ছে

সিএমএ-সিজিএম গ্রুপ, কসকো শিপিং, এভারগ্রিন ও ওরিয়েন্ট ওভারসিজ কনটেইনার (ওসিসিএল) নিজেদের মধ্যে পরিচালনা সহযোগিতা চুক্তি ওশান অ্যালায়েন্সের মেয়াদ আরও পাঁচ বছরের জন্য বাড়াতে সম্মত হয়েছে। সম্প্রতি এ বিষয়ে তাদের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে। ২০১৭ সালে ওশান অ্যালায়েন্স উদ্যোগের যাত্রা হয়। বিভিন্ন ধরনের শিপিং সলিউশন প্রদানের মাধ্যমে কাস্টমারস সাপ্লাই চেইনকে আরও বেশি গতিশীল করার লক্ষ্যে ১০ বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল প্রতিষ্ঠানগুলো। পাঁচ বছর মেয়াদ বাড়লে চুক্তিটি কার্যকর থাকবে ২০৩২ সাল পর্যন্ত।

এএফসিএফটিএর অধীনে প্রথম শিপমেন্ট কার্যক্রম উদ্বোধন করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা

আফ্রিকান কন্টিনেন্টাল ফ্রি ট্রেড এরিয়া (এএফসিএফটিএ) উদ্যোগের আওতায় প্রথম শিপমেন্ট ও প্রিফারেন্সিয়াল ট্রেড চালু করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। সম্প্রতি এএফসিএফটিএর মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের সাইডলাইনে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সাইরিল রামাফোসা ডারবান বন্দরে এই কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

এএফসিএফটিএ হলো আফ্রিকার সিংহভাগ অংশ নিয়ে গঠিত একটি মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল। ২০১৮ সালে ৪৩ পার্টি ও ১১ সিগনেটরি রাষ্ট্রের চুক্তি আফ্রিকান কন্টিনেন্টাল ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে এর যাত্রা।

সমুদ্রে নজরদারিতে স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ব্যবহারে সাফল্য দেখাল শ্রীলংকা

শ্রীলংকার মেরিন এনভায়রনমেন্ট প্রটেকশন অথরিটি (এমইপিএ) সম্প্রতি দারুণ এক সাফল্য দেখিয়েছে। নতুন স্যাটেলাইট সার্ভিল্যান্স সিস্টেম ব্যবহার করে তারা একটি জাহাজ থেকে অবৈধভাবে সাগরে তেল ফেলে দেওয়ার বিষয়টি ধরতে সক্ষম হয়েছে।

ফ্রান্সের সহায়তায় এই সার্ভিল্যান্স কার্যক্রম চালাচ্ছে এমইপিএ। যে জাহাজ থেকে তেল ফেলা হয়েছে, সেটির নাম গ্লোবাল ক্রেস্ট। ট্যাংকারটি পানামায় নিবন্ধিত। এমইপিএ জানিয়েছে সার্ভিল্যান্স সিস্টেমটি এ ধরনের আরও শতাধিক ঘটনার বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য দিয়েছে।

সংবাদ সংকেত

- ইতালিতে প্রথমবারের মতো প্রমোদভ্রমণে ব্যবহৃত বোটে গ্রিন হাইড্রোজেন রিফুয়েলিং সেবা দিতে অবকাঠামো গড়ে তুলবে ন্যাটপাওয়ার গ্রুপ। এ লক্ষ্যে ১০ কোটি ইউরো বিনিয়োগ করবে তারা।
- নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও আইন লঙ্ঘনের দায়ে কেএমএএক্স লিডার নামের লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী একটি বাল্ক ক্যারিয়ারকে ১২ মাসের জন্য নিষিদ্ধ করেছে অস্ট্রেলিয়ান মেরিটাইম সেফটি অথরিটি।
- সিএমএ সিজিএম গ্রুপ সম্প্রতি তাদের প্রথম এলএনজিচালিত ২ হাজার টিইইউ ধারণক্ষমতার কনটেইনার জাহাজ বুঝে পেয়েছে। এমন আরও নয়টি জাহাজ নির্মাণ করা হচ্ছে তাদের জন্য।
- ইউরোপের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল সাইবার সিকিউরিটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দাবি করেছে ডিএনভি। ২০২১ ও ২০২৩ সালে দুটি কোম্পানিকে অধিগ্রহণের পর এখন তাদের রয়েছে পাঁচ শতাধিক সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট।
- আর্কটিকে দূষণ প্রতিরোধে নীতিমালার খসড়া চূড়ান্ত করেছে আইএমও। গত ১৯-২৩ ফেব্রুয়ারি আইএমও পলিউশন প্রিভেনশন অ্যান্ড রেসপন্স সাবকমিটির বৈঠকে এ বিষয়ে চুক্তি হয়।
- দুই মাস আগে রেকর্ড পরিমাণ কোকেনসহ আটক ভিয়েতনামের একটি জাহাজ ও ক্রুদের মুক্তির জন্য ১ কোটি ২০ লাখ ডলারের বন্ড ও ১২ লাখ ডলারের ব্যাংক গ্যারান্টি জমা করার নির্দেশ দিয়েছেন ভারতীয় আদালত।
- নতুন পোর্ট ফ্যাসিলিটির নির্মাণকাজ শুরুর ঘোষণা দিয়েছে মালয়েশিয়ার কুয়ালা লিংগি ইন্টারন্যাশনাল পোর্ট (কেএলআইপি) কর্তৃপক্ষ। ৩১৪ কোটি ডলারের প্রকল্পের কাজ ৪২ মাসে শেষ হবে।
- নর্থ ফিল্ড অফশোর এক্সপ্যানশন প্রজেক্ট থেকে ইউরোপ ও এশিয়ায় এলএনজি বিক্রি বাড়াবে কাতারএনার্জি। একই সাথে এই প্রকল্পে আরও বেশি অংশীদার বিনিয়োগকারীর সাথে চুক্তি করবে তারা।
- ২০২৩ সালে নেদারল্যান্ডসের রটারডাম বন্দরে মোট কার্গো হ্যান্ডলিং হয়েছে ৪৩ কোটি ৮৮ লাখ টন, যা আগের বছরের ৬ দশমিক ১ শতাংশ কম।
- মৎস্য আহরণ সংক্রান্ত ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তির নবায়ন করেছে সেনেগাল ও গিনি-বিসাউ সরকার। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি এই নবায়ন চুক্তি স্বাক্ষর হয়।
- কোনো নাবিক চাইলে জাহাজ নিয়ে লোহিত সাগর পাড়ি দিতে অস্বীকৃতি জানাতে পারবেন। লোহিত সাগরে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের হামলার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা জানিয়েছে লেবার ইউনিয়ন।
- কানাডার মেরিন সেক্টরে কর্মরত মোট নাবিকের প্রায় অর্ধেক তার কর্মজীবনে হেনস্তা ও বুলিংয়ের শিকার হয়েছেন। সিফেয়ারারস ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব কানাডার প্রতিবেদনে এ তথ্য দেওয়া হয়েছে।

মিথানল-চালিত ১ হাজার ২৫০ টিইইউ ধারণক্ষমতার কনটেইনার জাহাজের জন্য চার্টার এগ্রিমেন্ট করেছে। ২০২৬ সালে জাহাজ দুটি তাদের কাছে সরবরাহ করা হবে। ইউনিফিডারের প্রতিদ্বন্দ্বী এক্স-প্রেস ফিডারস সম্প্রতি এভারগ্রিনের সাথে চুক্তি করেছে, যেন তাইওয়ানিজ ক্যারিয়ারটির কনটেইনারগুলো এক্স-প্রেসের নতুন ডুয়েল-ফুয়েল গ্রিন মিথানল ফিডারে করে পরিবহন করা হয়।

কনটেইনার শিপ চার্টার মার্কেটে চাঙ্গাভাব

লোহিত সাগরের উত্তেজনায় জাহাজগুলো আফ্রিকা উপকূল ঘুরে যাওয়ায় ট্রাফিক শিডিউলে যে পরিবর্তন এসেছে, তার সঙ্গে তাল মেলাতে ক্যারিয়ারগুলো হাব অ্যান্ড স্পোপ-টাইপ সার্ভিসের ওপর বেশি জোর দিচ্ছে। বিশেষ করে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এই পদ্ধতির ব্যবহার বেড়েছে, লোহিত সাগর সংকটের কারণে যে অঞ্চলকে সবচেয়ে বেশি ভুগতে হচ্ছে। এছাড়া সাপ্তাহিক ট্রান্সশিপমেন্টকেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভালো সমাধান হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। দুই ক্ষেত্রেই অপারেটরগুলোকে তাদের বহরে বাড়তি টনেজ যোগ করতে হচ্ছে। আর এর সুবাদে দারুণ চাঙ্গা হয়ে উঠছে কনটেইনার শিপ চার্টার মার্কেট।

মায়েরস্ক সম্প্রতি জানিয়েছে, তারা পারস্য উপসাগর থেকে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে পশ্চিম ও পূর্ব ভূমধ্যসাগরের বেশ কয়েকটি বন্দরে সাপ্তাহিক সার্ভিস চালু করবে।

ইসির ইম্পোর্ট স্টোরেজ সুবিধা কমানোর প্রস্তাবে শিপিং কমিউনিটির বিরোধিতা

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাইরে থেকে কোনো পণ্য সেখানে আমদানি করা হলে সেগুলো কাস্টমসের নিয়ন্ত্রণাধীন অস্থায়ী স্টোরেজে রাখতে হয়। বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী, পণ্য পৌঁছনোর তারিখ থেকে সর্বোচ্চ ৯০ দিন পর্যন্ত এই স্টোরেজে রাখা যাবে। এই সময়ের মধ্যেই সেগুলোর কাস্টমস প্রক্রিয়া সম্পন্ন অথবা পুনঃরপ্তানিকরণের ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে গত বছরের মে মাসে ইউরোপীয় কমিশনের (ইসি) একটি কাস্টমস সংশোধনী প্রস্তাবে এই মেয়াদ তিন দিনে নামিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে বিষয়টি ইউরোপীয় পার্লামেন্টে বিবেচনাধীন।

তবে ইউরোপীয় শিপিং কমিউনিটি এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছে। খাতসংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো বলছে, ইম্পোর্ট স্টোরেজ সুবিধা তিনদিনে নামিয়ে আনা হলে তা প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।

হেনস্তা-বুলিং প্রতিরোধে নতুন নীতিমালা আইসিএসের

মেরিটাইম খাতে হেনস্তা ও বুলিং প্রতিরোধ ও নির্মূল করার লক্ষ্যে নতুন কিছু নীতিমালা চালু করেছে ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব শিপিং (আইসিএস)। সংগঠনটি বিশ্বের ৮০ শতাংশের বেশি জাহাজমালিক ও অপারেটরদের প্রতিনিধিত্ব করে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), লয়েড'স রেজিস্টার ফাউন্ডেশন (এলআরএফ) ও গ্যালাপের একটি প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই নীতিমালা তৈরি করেছে আইসিএস। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, শিপিং খাতে কর্মরতদের প্রায় ২৩ শতাংশ কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও বুলিংয়ের শিকার হয়েছে। বিশ্বের ১২১টি দেশ ও টেরিটোরির বিভিন্ন খাতে কর্মরত ৭৪ হাজার ৩৬৪ জনের ওপর জরিপ চালিয়ে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। তবে জাহাজে আরোহণকৃত অবস্থায় এ ধরনের ঘটনার পরিসংখ্যান প্রতিবেদনে আসেনি। এই সংখ্যা যোগ হলে পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হবে বলে মনে করছে আইসিএস।

ব্যালাস্ট ও স্ক্রাবার ওয়াটারের নমুনা সংগ্রহ সহজ করেছে নরম্যাক

জাহাজ চলাকালীন ব্যালাস্ট ওয়াটার, স্ক্রাবার ওয়াটার, পানীয় জলসহ বিভিন্ন ধরনের পানি পরীক্ষার প্রক্রিয়া সহজতর করতে সম্প্রতি নমুনা কিট তৈরি করেছে নরম্যাক মেরিটাইম টেস্টিং সার্ভিসেস (এমটিসি)। সহজে ব্যবহারযোগ্য এই কিট দিয়ে বিশেষজ্ঞের সহায়তা ছাড়া জাহাজের ক্রুরাই কার্যকরভাবে পানির নমুনা সংগ্রহ করতে পারবে।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কার্যক্রম পরিচালনার সময় জাহাজ মালিক ও শিপিং কোম্পানিগুলোকে নিরাপত্তা ও পরিবেশ সংক্রান্ত বেশকিছু বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। নিয়মিত ব্যালাস্ট ওয়াটার, স্ক্রাবার ওয়াটার, পানীয় জলের পরীক্ষা যার মধ্যে অন্যতম। যুক্তরাষ্ট্রে চলাচলকারী জাহাজগুলোর অবশ্যই ভেসেল জেনারেল পারমিট (ভিজিপি) থাকতে হয়। সেসঙ্গে জাহাজের ব্যালাস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট সিস্টেমকে ডি-২ স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলতে হয়। নরম্যাক এমটিএসের মতো অনুমোদিত সাপ্লায়ার দ্বারা এসব সিস্টেমকে পরীক্ষা করতে হয়।

নরম্যাকের পরিচালক হান্স ভন দের ভার্ট জানান, পূর্বে জাহাজে লোক পাঠিয়ে নমুনা সংগ্রহ করায় অতিরিক্ত সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হতো। অন্যদিকে ম্যানুয়াল অনুযায়ী নরম্যাকের কিট ব্যবহার করে জাহাজের ক্রুরা বন্দরে নোঙর করা অবস্থায় ব্যালাস্ট ওয়াটার এবং সাগরে ইঞ্জিন পূর্ণোদমে চলাচলের সময় স্ক্রাবার ওয়াটার সংগ্রহ করতে পারবেন, যা পরবর্তীতে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে পরীক্ষা করা হবে।

এসব পরীক্ষার ফলাফল নরম্যাকের ক্লায়েন্ট পোর্টালে সংরক্ষণ করা হয়। আইনি বাধ্যবাধকতা পালনের সময় জাহাজ মালিকেরা সহজেই পোর্টাল থেকে সেসব তথ্য ব্যবহার করতে পারবেন। উল্লেখ্য, এজেন্টের মাধ্যমে নৌবহরের মালিকদের কাছে নমুনা কিট সরবরাহ করে নরম্যাক। সাপ্লাই শিপমেন্টের সাথে ওয়্যারহাউস থেকে সেসব কিট জাহাজে পৌঁছে দেওয়া হয়।

বন্দর পরিচিতি

চার্লসটন বন্দর

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য সাউথ ক্যারোলিনার গুরুত্বপূর্ণ একটি বন্দর হলো পোর্ট অব চার্লসটন। বন্দর কমপ্লেক্সটি বেশ বড়, তিনটি মিউনিসিপ্যালিটি জুড়ে এর বিস্তৃতি। এগুলো হলো–চার্লসটন, নর্থ চার্লসটন ও মাউন্ট প্লিজ্যান্ট। বন্দরটিতে ছয়টি পাবলিক টার্মিনাল রয়েছে, যেগুলো সবার জন্য উন্মুক্ত। সবগুলোরই মালিক ও পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ হলো সাউথ ক্যারোলিনা পোর্টস অথরিটি (এসসিপিএ)। টার্মিনালগুলোয় কনটেইনার, মোটরগাড়িসহ সব ধরনের রোলিং স্টক, নন-কনটেইনারাইজড পণ্য, প্রজেক্ট কার্গো–সবই হ্যান্ডলিং হয়। এছাড়া রয়েছে একাধিক বেসরকারি টার্মিনাল, সেগুলোয় প্রধানত পেট্রোলিয়াম, কয়লা, ইস্পাতের মতো বাল্ক কমোডিটি হ্যান্ডলিং করা হয়। প্রমোদতরী পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাদিও রয়েছে চার্লসটন বন্দরে।

একটি বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে চার্লসটন শহরের পত্তন হয় ১৬৭০ সালে। চার্লসটন নামটি এসেছে চার্লস টাউন থেকে। চার্লসটন উপদ্বীপটির একটি বিশেষ সুবিধা ছিল। প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হারবার ছিল সেখানে। এই সুবিধা কাজে লাগিয়েই সেখানে একটি বন্দর গড়ে তোলা হয়, যেটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা ১৬৮২ সালে। ওই সময় থেকে আমেরিকান গৃহযুদ্ধের (১৮৬১-৬৫) সূচনা পর্যন্ত অর্থাৎ পৌনে দুইশ বছর ধরে এই বন্দর দিয়ে কাঠ, পশম, চামড়া, চাল, নীল, তুলা, তামাক ইত্যাদি পণ্য রপ্তানি হয়েছে। আঠারো শতকের শেষ অব্দি প্রচুর পরিমাণে আফ্রিকান দাস আমেরিকায় আনা হতো এই বন্দর দিয়ে। এসব বাণিজ্যের সুবাদে চার্লসটনের একসময়ের ছোট্ট সেই কলোনির পরিসর বড় হতে শুরু করে।

গৃহযুদ্ধের কারণে চার্লসটন বন্দরের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। সি মাইন ও জাহাজের ধ্বংসাবশেষের কারণে এর পোতাশ্রয় জাহাজ চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। সে সময় আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনীতিও ভঙ্গুর ছিল। রপ্তানি কমে গিয়েছিল অনেকখানি। চার্লসটনের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জেটিগুলোও অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। তবে চার্লসটন হারবারের জৌলুস ফিরে আসতে খুব বেশি সময় লাগেনি। বিশ শতকের শুরুর দিকে এই অঞ্চলে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ ফেডারেল মিলিটারি বেজ স্থাপনের সুবাদে চার্লসটন হারবারের সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ হয়েছিল খুব ভালোভাবে।

১৯২০-এর দশকের শুরুর দিকে চার্লসটনের তৎকালীন মেয়র জন পি গ্রেস চার্লসটন বন্দরের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পুনরুজ্জীবিত করার গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং পোর্ট ইউটিলিটিজ কমিশন গঠন করেন। সে সময় চার্লসটন উপদ্বীপের বেশিরভাগ উপকূলীয় সম্পদের মালিক ছিল চার্লসটন টার্মিনাল কোম্পানি। ১৯২২ সালে নগর কর্তৃপক্ষ ১৫ লাখ ডলারে সেই কোম্পানিকে কিনে নেয়। ১৯৪২ সালে গঠিত হয় সাউথ ক্যারোলিনা পোর্টস অথরিটি (এসসিপিএ)। অঙ্গরাজ্যটির সব ধরনের নৌবাণিজ্যের দেখভাল ও উন্নয়নের দায়িত্ব পায় তারা। বর্তমানে চার্লসটন বন্দরের নিয়ন্ত্রণও তাদের হাতে।

কার্গো ভ্যালুর দিক থেকে বর্তমানে চার্লসটন বন্দর যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ ১০ বন্দরের একটি। ২০২৩ সালে বন্দরটিতে মোট কনটেইনার হ্যান্ডলিং হয়েছিল ২৪ লাখ ৮২ হাজার টিইইউ। ২০২৩ সালের লয়েড'স লিস্টে বিশ্বের শীর্ষ ১০০ কনটেইনার পোর্টের তালিকায় চার্লসটনের অবস্থান ৭৭তম।

বন্দরের ছয়টি পাবলিক টার্মিনাল হলো–ইউনিয়ন পিয়ার টার্মিনাল (ক্রুজ টার্মিনাল), কলাম্বাস স্ট্রিট টার্মিনাল, ওয়ান্দো ওয়েলশ টার্মিনাল, হিউ কে লেদারম্যান টার্মিনাল, ভেরোনাস টার্মিনাল ও নর্থ চার্লসটন টার্মিনাল। ২০১৬ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে এসসিপিএ চার্লসটন বন্দরের বিদ্যমান সুবিধাদির উন্নয়ন ও নতুন সুবিধা সংযোজনের পেছনে ১০৫ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে। বন্দরের হারবারের গভীরতাও বাড়ানো হয়েছে। বর্তমানে ভাটার সময়েও প্রবেশ ও হারবার চ্যানেলে প্রায় ১৬ মিটার ড্রাফট নিয়ে চার্লসটন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের গভীরতম সমুদ্রবন্দর। পোস্ট-প্যানাম্যাক্স জাহাজগুলো নিয়মিত এই বন্দরের সেবা গ্রহণ করছে।

এসসিপিএ সম্প্রতি নর্থ চার্লসটন টার্মিনালের সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ২৮০ একর জমি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেখানে অবকাঠামো গড়ে তোলা হলে টার্মিনালটির কনটেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা ৫০ লাখ টিইইউতে উন্নীত হবে।

মেরিটাইম ইভেন্টস

মেরিটাইম ডিকার্বনাইজেশন কনফারেন্স, এশিয়া

৩-৪ এপ্রিল, সিঙ্গাপুর

গত জানুয়ারিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) এমিশন ট্রেডিং সিস্টেম (ইটিএস) ও মার্চে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের (আইএমও) মেরিন এনভায়রনমেন্ট প্রটেকশন কমিটির (এমইপিসি) ৮১তম অধিবেশনের পর নিঃসরণ নিয়ে ইইউ ও আইএমওর ভবিষ্যৎ কর্মকৌশলের ওপর আলোকপাত করা হবে কনফারেন্সে। মিথানল ও অ্যামোনিয়ার মতো সবুজ জ্বালানির সাপ্লাই চেইন, বায়োফুয়েলের সাপ্লাই ফোরকাস্ট ও দীর্ঘমেয়াদি মূল্য নির্ধারণ কাঠামো, সবুজ অর্থায়ন, ব্যাংক অর্থায়নে অগ্রাধিকারমূলক বিষয়সমূহ বিষয় উঠে আসবে আলোচনায়।

বিস্তারিত : https://bit.ly/3K74FMV

সি জাপান

১০-১২ এপ্রিল, টোকিও, জাপান

১৯৯৪ সালে জাপানের ইয়োকোহামা শহরে আয়োজনটির যাত্রা হলেও এখন প্রতি দুই বছর অন্তর এটি টোকিওতে আয়োজিত হচ্ছে। জাহাজ নির্মাণ ও সমুদ্র পরিবহন খাতের অংশীজনরা এই আয়োজনে অংশ নিয়ে সর্বাধুনিক মেরিন প্রযুক্তি ও অন্যান্য বিষয় তুলে ধরবেন। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের সরবরাহকারীদের সাথে তাদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের আদর্শ প্লাটফর্ম হিসেবেও কাজ করবে আয়োজনটি। প্রদর্শনীর পাশাপাশি এতে থাকবে উচ্চপর্যায়ের আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, টেকনিক্যাল সেমিনার, নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট ইত্যাদি।

বিস্তারিত : https://bit.ly/44F75fq

সিঙ্গাপুর মেরিটাইম উইক

১৫-১৯ এপ্রিল, সিঙ্গাপুর

মেরিটাইম অ্যান্ড পোর্ট অথরিটি অব সিঙ্গাপুর (এমপিএ) আয়োজিত এই ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্টে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মেরিটাইম খাতের নেতারা উপস্থিত থাকবেন। এই খাতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সর্বশেষ ট্রেন্ড, সম্ভাবনা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করবেন তারা। এ বছর আয়োজনটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'অ্যাকশনস মিট অ্যাম্বিশন'। মেরিটাইম খাতে ডিকার্বনাইজেশন ও ডিজিটালাইজেশন নিয়ে আমাদের যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তা অর্জনে আমরা কী সমন্বিত পদক্ষেপ নিয়েছি ও নিতে যাচ্ছি, তা তুলে ধরা হবে আয়োজনটিতে।

বিস্তারিত : https://bit.ly/44FgxPY

গ্রন্থ পরিচিতি

সেইলিং স্কুল : নেভিগেটিং সায়েন্স অ্যান্ড স্কিল, ১৫৫০-১৮০০

মার্গারেট ই শোটে

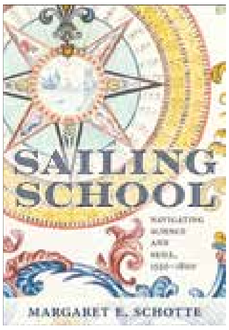

এজ অব এক্সপ্লোরেশন বা আবিষ্কারের যুগে ইউরোপের মেরিটাইম কমিউনিটির মূল নজর ছিল ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের দিকে। এ সময়ে সমুদ্রাভিযান ছিল আকাশের চাঁদ-তারা দেখে জাহাজের গতিপথ নির্ণয়-নির্ভর। এই পদ্ধতি ছিল বেশ জটিল। গণিতের অনেক হিসাব-নিকাশ ছিল তাতে। নাবিকদের সেগুলো শেখানোর জন্য ইউরোপীয়রা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল। প্রকাশ করেছিল পাঠ্যপুস্তক। উদ্ভাবন করেছিল প্রশিক্ষণ ইনস্ট্রুমেন্ট।

তবে শিখন পদ্ধতি হিসেবে কোনটি বেশি সহায়ক– তাত্ত্বিক না ব্যবহারিক, স্মৃতিনির্ভরতা না গাণিতিক হিসাব-নিকাশ, সে বিষয়ে বরাবরই বিতর্ক রয়েছে। আলোচ্য সময়েও তার ব্যতিক্রম ছিল না। সে কারণেই ইউরোপীয়রা হাইব্রিড মডেল তৈরি করেছিল, ফলিত বিজ্ঞানের ওপর যার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

সেইলিং স্কুল বইটিতে লেখিকা দুই শতাধিক বছরের জাহাজ চলাচলের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। রূপান্তরকালীন সেই সময়ের একটি সচিত্র বিবরণ তিনি প্রকাশ করেছেন বইটিতে। আধুনিক যন্ত্রপাতি ছাড়া সে যুগের সমুদ্রযাত্রায় চ্যালেঞ্জ কম ছিল না। নাবিকরা কীভাবে সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছেন, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন লেখিকা।

মার্গারেট শোটে বইটি শুরু করেছেন ষোড়শ শতকে নাবিকদের প্রশিক্ষণ ও সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে বিখ্যাত ইবেরিয়ান মডেল দিয়ে। এরপর তিনি নিয়ে গেছেন মেরিটাইম ম্যানুয়াল দিয়ে ঠাসা একটি ডাচ বুকশপে। তারপর পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন ফরাসি ত্রিকোণমিতির সাথে, যেখানে বলা হয়েছে যে, 'নেভিগেশন একটি সমকোণী ত্রিভুজ ছাড়া আর কিছুই না'। বইটিতে একজন তরুণ ব্রিটিশ নৌ-কর্মকর্তার চোখে আঠারো শতকের সমুদ্র শিল্পকে দেখানো হয়েছে, যিনি দীর্ঘ দুই মাস তার ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজকে ভাসিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সেইলিং স্কুল বইটিতেই প্রথম নেভিগেশন খাতে প্রকাশনা জগতের গুরুত্ব নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। মার্গারেট শোটে ছয়শ বছরে প্রকাশিত বিপুল সংখ্যক আর্কাইভাল রেকর্ড পড়ে দেখেছেন, যেগুলোর মধ্যে ছিল শত শত পাঠ্যপুস্তক ও অন্তরালে থেকে যাওয়া পাণ্ডুলিপি। এর সুবাদেই সেইলিং স্কুল বইটি সমুদ্র শিল্পের ইতিহাস, বৈজ্ঞানিক বিপ্লব ও প্রকাশনা খাতের ভূমিকার মধ্যে একটা পরিষ্কার সম্পর্ক টানতে সক্ষম হয়েছেন।

৩২০ পৃষ্ঠার হার্ডকভার বইটির প্রকাশক জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটি প্রেস। মূল্য ৬২ ডলার।

আইএসবিএন-১০: ১৪২১৪২৯৫৩৫
আইএসবিএন-১৩: ৯৭৮-১৪২১৪২৯৫৩৩

মেরিটাইম ফ্যাক্ট

রো-রো জাহাজ ও ফেরি

অন/রোল-অফ বা রো-রো শিপ হলো বিশেষ এক ধরনের কার্গো জাহাজ, যেগুলো মোটরযান পরিবহন করতে পারে। ব্যক্তিগত গাড়ি, ট্রাক, বাস, ট্রেলার, সেমি-ট্রেলার, মোটরসাইকেল ইত্যাদি মোটরযান ক্রেনের সাহায্যে বোঝাই না করে সেগুলোকে চালিয়ে নিয়ে রো-রো জাহাজে তোলা এবং নামানো হয়।

আধুনিক যুগে মোটরযানের বাজার আঞ্চলিকতার গণ্ডি পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বজুড়ে। ফলে বিশ্বের এক প্রান্তে উৎপাদিত মোটরগাড়ি পৌঁছে দিতে হচ্ছে অন্য কোনো প্রান্তে। এই কাজে সবচেয়ে বড় সমাধান হলো রো-রো জাহাজ। এছাড়া মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ রক্ষার কাজেও রো-রো ফেরি ব্যবহার করা হয়। বড় বড় নদীতেও গাড়ি পারাপারে এই ধরনের ফেরি ব্যবহৃত হয়। রো-রো ভেসেল কার্গো শিপ, বার্জ, ক্রুজ ফেরি, ফেরি ইত্যাদি ধরনের হয়ে থাকে।

রো-রো জাহাজ বা ফেরিতে মোটরযান ওঠানো বা নামানো হয় র‍্যাম্পের ওপর দিয়ে চালিয়ে। এই র‍্যাম্প কখনো বিল্ট-ইন হয় অর্থাৎ জাহাজের সাথে সংযুক্ত থাকে। আবার কখনো শোর-বেজড র‍্যাম্প ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের র‍্যাম্প ডকিং প্লাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকে। নদী পারাপার বা স্বল্প দূরত্বে চলাচলকারী রো-রো ফেরিগুলোর বেশিরভাগেরই বিল্ট-ইন র‍্যাম্প থাকে। এই র‍্যাম্পের মাধ্যমে গাড়িগুলোকে চালিয়ে ফেরি থেকে পন্টুনে নামানো হয়। বিল্ট-ইন র‍্যাম্প জাহাজের সামনে, পেছনে, দুই পাশে অথবা যেকোনো সুবিধাজনক অবস্থানে লাগানো থাকে। জাহাজ বা ফেরি চলাচলের সময় সেগুলো ওঠানো থাকে। সেগুলো ঘাটে বা বন্দরে ভিড়লে র‍্যাম্প নামিয়ে দেওয়া হয়।

শিপিং ইন্ডাস্ট্রিতে অন্যান্য কার্গো টনেজে পরিমাপ করা হলেও রো-রো কার্গো পরিমাপের একক হলো লেনস ইন মিটারস বা এলআইএম। এটি হিসাব করা হয় গাড়ির দৈর্ঘ্য, ডেক সংখ্যা ও প্রস্থ গুণ করে। ব্যক্তিগত গাড়ি পরিবহনকারী জাহাজগুলোয় (পিসিসি) বেশিরভাগ সময়েই কার্গো ক্যাপাসিটি পরিমাপ করা হয় আরটি অথবা আরটি৪৩ অথবা কার-ইকুইভ্যালেন্ট ইউনিটস (সিইইউ) এককে। আরটি৪৩ এককটি এসেছে ১৯৬৬ মডেলের টয়োটা করোনা কারের বডি মেজারমেন্টের ভিত্তিতে। এটি ছিল বিশ্বের সর্বপ্রথম বহুল উৎপাদিত গাড়ি, যেগুলো বাজারজাতের জন্য রো-রো জাহাজ ব্যবহার করা হয়েছিল।

মেরিটাইম ব্যক্তিত্ব

ম্যালকম পুরসেল ম্যাকলিন

ম্যালকম পুরসেল ম্যাকলিন ছিলেন একজন মার্কিন ব্যবসায়ী। কিন্তু এই পরিচয় তার কীর্তি প্রকাশের জন্য যথেষ্ট নয়। বিশ্বায়নের যুগে যে নিত্যপণ্য বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছে, তার জন্য তাকে অবশ্যই কৃতিত্ব দিতে হবে। কারণ তিনি আধুনিক ইন্টারমোডাল শিপিং কনটেইনারের আবিষ্কারক, যা বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সমুদ্র পরিবহন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছিল।

একটা সময় পর্যন্ত সমুদ্র পরিবহন খাতে ব্যবহৃত কনটেইনারগুলো কেবল জাহাজে পরিবহনের উপযোগী ছিল। বন্দরে এসব কনটেইনার থেকে পণ্য খালাস করে তারপর অন্য কোনো কার্গো ক্যারিয়ারে করে সেগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছানো হতো। এতে কয়েকটি সমস্যা হতো। প্রথমত, কার্গো অন্য কোনো গাড়িতে করে বন্দরে এনে কনটেইনারজাত করা অথবা কনটেইনার থেকে নামিয়ে অন্য গাড়িতে বোঝাই করার কাজে সময় বেশি লাগত। দ্বিতীয়ত, এই কাজের সময় পণ্য চুরি যাওয়ার ঝুঁকিও ছিল। তৃতীয়ত, পণ্যের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। চতুর্থত, ট্রানজিটের সময় কার্গোর ইনভেন্টরি ব্যয় বেশি ছিল।

ইন্টারমোডাল কনটেইনার আবিষ্কারের ফলে এখন আর পণ্য কনটেইনার থেকে নামিয়ে তারপর অন্য গাড়িতে বোঝাই করা লাগে না। পুরো কনটেইনারটিই সড়ক বা রেলপথে অন্য ক্যারিয়ারে উঠিয়ে দেওয়া যায়। এতে করে উপরিল্লিখিত যে সমস্যাগুলো ছিল, সেগুলোও দূর করা সম্ভব হয়েছে।

ম্যাকলিনের জন্ম ১৯১৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনা অঙ্গরাজ্যের ম্যাক্সটন শহরে। ১৯৩৫ সালে তিনি তার দুই ভাই-বোনের সাথে মিলে একটি ট্রাক পরিবহন কোম্পানি গড়ে তোলেন। ট্রাকে করে পণ্য পরিবহনের এই কার্যক্রমের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা থেকেই তার মাথায় ইন্টারমোডাল কনটেইনার নির্মাণের বুদ্ধি আসে। সমুদ্র পরিবহন খাতকে বদলে দেওয়া এই মহান ব্যক্তিত্বের মৃত্যু ২০০১ সালে।

নামমাত্র মূল্যে সরকার থেকে জমি পাওয়ার ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে চট্টগ্রাম বন্দরের প্রায় ১ হাজার ২৩৮ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। এই টাকা দ্রুত বে-টার্মিনালের অবকাঠামো তৈরিতে সহায়ক হবে

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় নামমাত্র মূল্যে জমি পাচ্ছে বে-টার্মিনাল প্রকল্প

দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা বে-টার্মিনালের ৫০০ দশমিক ৭১ একর সরকারি খাসজমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন ওই জমির মূল্য ১ হাজার ২৪১ কোটি টাকা নির্ধারণ করলেও প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ সেই জমি পাচ্ছে ৩ কোটি টাকায়। নামমাত্র মূল্যে সরকার থেকে জমি পাওয়ার ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে চট্টগ্রাম বন্দরের প্রায় ১ হাজার ২৩৮ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। এই টাকা দ্রুত বে-টার্মিনালের অবকাঠামো তৈরিতে সহায়ক হবে।

গত ৩১ জানুয়ারি ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে বে-টার্মিনালের জন্য ৫০০ দশমিক ৭১ একর সরকারি খাসজমি ৩ কোটি ৩ টাকায় বন্দর কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য চিঠি পাঠায়। এখন জেলা প্রশাসন থেকে বন্দর কর্তৃপক্ষকে ওই টাকা সরকারি কোষাগারে জমা এবং জেলা প্রশাসন কর্তৃক ওই জমি বন্দরকে হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

এর আগে গত বছরের জুলাইয়ে ৫০০ একর খাসজমির মূল্য পুনর্নির্ধারণ করে জেলা প্রশাসন। নতুন সেই হিসাব অনুযায়ী ওই জমির জন্য ১ হাজার ২৪১ কোটি টাকা নির্ধারণ করে জেলা প্রশাসন থেকে নতুন প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। এই ৫০০ একরের মধ্যে রয়েছে পতেঙ্গা, আগ্রাবাদ ও কাট্টলী সার্কেলের জায়গা। তবে ওই জমি প্রতীকী মূল্যে পেতে চট্টগ্রাম বন্দরের করা আবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে।

কর্তৃপক্ষ বলছে, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার ফলেই অল্প সময়ের মধ্যেই পাওয়া যাবে ভূমি। জেলা প্রশাসন থেকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ভূমি হস্তান্তরের কাজ দ্রুত শেষ হবে।

বন্দর কর্তৃপক্ষ পণ্য হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে নগরীর পতেঙ্গা-হালিশহর সমুদ্র উপকূলে প্রায় আড়াই হাজার একর ভূমিতে বে-টার্মিনাল নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। এর মধ্যে ৭৯১ দশমিক ৭৮ একর ভূমি সমুদ্র উপকূল থেকে পাওয়া যাবে। বাকিটা সমুদ্র থেকে পুনরুদ্ধার করার কথা রয়েছে। তারও আগে ২০২১ সালে ৬৬ দশমিক ৮৫ একর ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি বন্দরকে বুঝিয়ে দেয় চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন। এ ভূমির অধিগ্রহণ মূল্য ছিল প্রায় ৪০০ কোটি টাকা।

প্রস্তাবিত বে-টার্মিনাল হবে চট্টগ্রাম বন্দরের বর্তমান অবকাঠামোর চেয়েও বড়। চট্টগ্রাম বন্দর বছরে যে পরিমাণ পণ্য হ্যান্ডলিং করতে পারে, শুধু বে-টার্মিনালেই হ্যান্ডলিং করা যাবে তার কয়েকগুণ বেশি। বে-টার্মিনাল প্রকল্পের আওতায় তিনটি টার্মিনাল নির্মিত হবে। এর মধ্যে একটি নির্মাণ ও পরিচালনা করবে বন্দর কর্তৃপক্ষ। বাকি দুটি টার্মিনাল পিপিপি ভিত্তিতে বিদেশি বিনিয়োগে নির্মাণ করা হবে। এরই মধ্যে দুটি টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য দুবাইভিত্তিক ডিপি ওয়ার্ল্ড ও সিঙ্গাপুরভিত্তিক পোর্ট অব সিঙ্গাপুর অথরিটির সাথে সংশ্লিষ্টদের আলোচনা চলছে।

সমুদ্রসম্পদ আহরণে আমাদের কাজ করতে হবে : প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমাদের এরই মধ্যে চারটি মিলিটারি একাডেমি করা হয়েছে। পরিকল্পনা আছে প্রত্যেকটা বিভাগে মিলিটারি একাডেমি প্রতিষ্ঠা করে দেব। সমুদ্রে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য লোক দরকার। আমরা দক্ষ জনশক্তি তৈরির উদ্যোগ নিয়েছি। আরও দক্ষ জনশক্তি যেন হয় সে উদ্যোগটা আমরা নেব। আমাদের সমুদ্রের যে সম্পদ রয়েছে, মৎস্যসম্পদ বা সামুদ্রিক অন্যান্য উদ্ভিদ, বিশেষ করে আমাদের খনিজ সম্পদ, তেল, গ্যাস উত্তোলন, সমস্ত কাজ আমাদের করতে হবে, যেটা আমাদের দেশের জন্য প্রয়োজন। এগুলোর নিরাপত্তার জন্য আমাদের নৌবাহিনী ও কোস্ট গার্ডকে শক্তিশালী করে দিচ্ছি।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ২২ ফেব্রুয়ারি 'দ্য টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোন অ্যাক্ট-১৯৭৪'-এর সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশ নৌবাহিনী আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা কারো সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হব না। স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার মতো সক্ষমতা আমাদের থাকতে হবে। আমাদের সুবিশাল জলরাশির নিরাপত্তার জন্য নৌবাহিনীর দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ। সেটা তারা যথাযথভাবে পালন করে যাচ্ছে। নৌবাহিনীকে আমি ত্রিমাত্রিক বাহিনীতে উন্নীত করেছি। আসলে সব বাহিনীকেই আমি উন্নত করেছি। ভৌগোলিকভাবে ছোট দেশ হলেও জনসংখ্যার দিক থেকে আমরা ছোট না। তাছাড়া জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে আমরা অবদান রাখছি। সেখানে যারা কর্তব্য পালন করতে যাবে, তারা সবদিক থেকে দক্ষ হোক সেটা আমি চাই। প্রশিক্ষণটা বড় দরকার।

সমুদ্রের তেল-গ্যাস উত্তোলনের জন্য বিদেশি বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, আমরা চাই আমাদের দেশ আরও এগিয়ে যাবে, সেজন্য যথাযথ বিনিয়োগ প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী যারা বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগ করেন, তাদের আহ্বান জানাব আমাদের সমুদ্রের তেল-গ্যাস উত্তোলনের জন্য। আমরা যেন এগুলো ভালোভাবে উত্তোলন করতে পারি, অর্থনীতিতে কাজে লাগাতে পারি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণের জন্য ১৯৭৫ সালের পরবর্তী সরকারগুলো কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। আওয়ামী লীগ সরকার অত্যন্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করে। ২০১২ ও ২০১৪ সালে মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্রসীমার নিষ্পত্তি করি। আজকে আমরা সম্ভাবনাময় একটা বিশাল অর্থনৈতিক এলাকা পেয়েছি, যে এলাকা আমাদের অর্থনীতিতে অনেক অবদান রাখতে পারবে।

অনুষ্ঠানে নৌপরিহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী ও নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম নাজমুল হাসান বক্তব্য রাখেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামুদ্রিক বিষয়ক ইউনিটের সচিব রিয়ার এডমিরাল (অব.) মো. খুরশেদ আলম। এ সময় চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েলসহ বিভিন্ন সংস্থার প্রধানগণ ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আলাদা আলাদা প্যাভিলিয়নে বাংলাদেশ নৌবাহিনী, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষসহ দেশের মেরিটাইম খাতের সব সংস্থার অর্জন ও অগ্রগতি তুলে ধরে স্ব স্ব সংস্থা।

রপ্তানি পণ্য স্ক্যানিংয়ে কাস্টমসে দুটি স্ক্যানার হস্তান্তর করেছে চট্টগ্রাম বন্দর

রপ্তানি পণ্য স্ক্যানিংয়ে কাস্টমসে দুটি স্ক্যানার হস্তান্তর করেছে চট্টগ্রাম বন্দর। চট্টগ্রাম বন্দরের নিজস্ব অর্থায়নে সংগ্রহ করা ফিক্সড কনটেইনার স্ক্যানার দুটি

১৭ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম বন্দরের নিজস্ব অর্থায়নে সংগৃহীত দুইটি স্ক্যানার মেশিনের উদ্বোধন করেন নৌপ্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী এমপি। এ সময় সিনিয়র নৌসচিব মো. মোস্তফা কামাল ও বন্দর চেয়ারম্যানসহ অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

উদ্বোধন করেছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী। ১৭ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম বন্দরের ৪ নম্বর গেটে স্থাপিত একটি স্ক্যানার ও সিপিএআর গেটে আরেকটি স্ক্যানার উদ্বোধন করা হয়।

এ সময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, ২০১৯ সালে প্রধানমন্ত্রী এনবিআর চেয়ারম্যানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সব বন্দরে স্ক্যানার বসাতে হবে। তার আন্তরিকতায় অনেক স্ক্যানার বসানো হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরে রপ্তানি পণ্যের জন্য দুটি স্ক্যানার বসানোর খবর শুনে প্রধানমন্ত্রী খুশি হয়েছেন।

বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মোস্তফা কামাল।

নৌ সচিব বলেন, প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন বন্দরে স্ক্যানার বসাতে। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে চাই স্মার্ট গভর্ন্যান্স। এনবিআরের কাজে বন্দর সহযোগিতা করছে। ভবিষ্যতেও করা হবে।

বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর প্রথম শ্রেণির কেপিআই। বিশ্বের ১০০ শীর্ষ বন্দরে আমরা ৬৭তম। প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা ও নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে বন্দর এগিয়ে চলছে। প্রথমবারের মতো আধুনিক স্ক্যানার স্থাপন করেছি। বন্দরের পিসিটিতে সৌদিভিত্তিক রেড সি গেটওয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। বে-টার্মিনালের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। স্ক্যানার দুটি কাস্টম হাউস অপারেট করবে। এর ফলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে রপ্তানি কনটেইনার জাহাজীকরণ সম্ভব হবে। বন্দরের নিরাপত্তা ও ভাবমূর্তি বাড়বে।

প্রকল্প পরিচালক ও চট্টগ্রাম বন্দরের নিরাপত্তা পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোস্তফা আরিফুর রহমান খান জানান, চট্টগ্রাম বন্দরের নিজস্ব অর্থায়নে ৮৫ কোটি ৮৯ লাখ টাকায় সংগৃহীত এফএস৬০০০ মডেলের রেডিও একটিভ পোর্টাল মনিটর সমৃদ্ধ এ স্ক্যানার ঘণ্টায় ১৫০টি কনটেইনার স্ক্যান করতে পারে।

উদ্বোধনের পর বন্দরের নিরাপত্তা পরিচালক স্ক্যানার দুটি পরিচালনার ভার চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস কমিশনার মোহাম্মদ ফয়জুর রহমানের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন।

এ প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন হয় ২০২২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি। সর্বনিম্ন দরদাতা ফাইভ আর অ্যাসোসিয়েটের দরপত্র ওই বছরের ২৯ নভেম্বর মন্ত্রণালয় অনুমোদন দেয়। ১২ ডিসেম্বর কার্যাদেশ, ২০২৩ সালের ৫ জানুয়ারি চুক্তি সম্পাদন এবং ২৭ ডিসেম্বর প্রকল্পের কাজ শেষ হয়। আইএসপিএসের আলোকে বন্দরের সব রপ্তানি গেটে কনটেইনার স্ক্যানার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করল চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

বড় জাহাজ ভেড়ানোয় বেড়েছে কনটেইনার হ্যান্ডলিং

চট্টগ্রাম বন্দরে বড় জাহাজ ভেড়ানোর সুযোগ তৈরি হয় গত বছরের জানুয়ারিতে। নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী ১০ মিটার ড্রাফট এবং ২০০ মিটার দৈর্ঘ্যের জাহাজ ভেড়ানোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এর সুফল এখন দৃশ্যমান হচ্ছে। গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় এবার জুলাই থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত সাত মাসে বন্দরে জাহাজ চলাচল কমেছে ১৭৫টি। তবে ইতিবাচক তথ্য হলো, জাহাজ কমলেও বেড়েছে কনটেইনার হ্যান্ডলিং। একই জাহাজে অধিক পরিমাণে কার্গো ও কনটেইনার পরিবহন করা যায় বলেই এখন বন্দরে জাহাজের যাতায়াত কমছে।

জাহাজ হ্যান্ডলিংয়ের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত গত সাত মাসে চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ যাতায়াত কমেছে ১৭৫টি। ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত গত সাত মাসে বন্দরে জাহাজ হ্যান্ডলিং করা হয় ২ হাজার ৫৪৪টি, সেখানে চলতি অর্থবছরের জানুয়ারি পর্যন্ত গত সাত মাসে জাহাজ হ্যান্ডলিং করা হয় ২ হাজার ৩৬৯টি।

বন্দরে জাহাজ যাতায়াত কমলেও ইতিবাচক ধারায় ছিল কনটেইনার হ্যান্ডলিং। সাধারণত জাহাজ যাতায়াত কমায় কনটেইনার হ্যান্ডলিং কমে যাওয়ার কথা থাকলেও গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় এখন বন্দরে কনটেইনার হ্যান্ডলিং বেড়েছে। গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় চলতি অর্থবছরের গত সাত মাসে বন্দরে কনটেইনার হ্যান্ডলিং বেড়েছে ৮৬ হাজার ৯২৪ টিইইউ (একক)। গত অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে চট্টগ্রাম বন্দরে আমদানি এবং রপ্তানি মিলে কনটেইনার হ্যান্ডলিং হয় ১৭ লাখ ৩১ হাজার ৮৩১ টিইইউ। সেখানে এ বছরের গত সাত মাসে কনটেইনার হ্যান্ডলিং হয়েছে ১৮ লাখ ১৮ হাজার ৭৫৫ টিইইউ।

একই সময়ে বন্দরে কার্গো হ্যান্ডলিংও বেড়েছে। গত অর্থবছরের প্রথম সাত মাসের তুলনায় এই অর্থবছরের গত সাত মাসে কার্গো হ্যান্ডলিং বেড়েছে ২৯ লাখ ২৫ হাজার ৮৮১ মেট্রিক টন। ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে কার্গো হ্যান্ডলিং করা হয় ৬ কোটি ৭৪ লাখ ৩২ হাজার ১২৫ মেট্রিক টন। সেখানে এই বছর প্রথম সাত মাসে বন্দরে কার্গো হ্যান্ডলিং হয়েছে ৭ কোটি ৩ লাখ ৫৮ হাজার ৬ টন।

বন্দর কর্তৃপক্ষের মতে, বন্দরে জাহাজ যাতায়াত কমলেও একই সময়ে কার্গো ও কনটেইনার হ্যান্ডলিং– দুই-ই বেড়েছে। তার মানে বন্দরের কর্মযজ্ঞ কমছে তা নয়। জাহাজ কম আসার পরও কার্গো এবং কনটেইনার হ্যান্ডলিং বাড়ার কারণ হচ্ছে এখন আগের চেয়ে বড় জাহাজ বন্দরে ভিড়তে পারছে। আগে একটি জাহাজে কম পণ্য আসত, সেখানে এখন একটি জাহাজে বেশি পণ্য পরিবহন করা হচ্ছে। তাই জাহাজ যাতায়াত কমলেও বন্দরে কার্গো এবং কনটেইনার হ্যান্ডলিং বাড়ছে।

বাংলাদেশ-থাইল্যান্ডে সরাসরি জাহাজ চলবে

বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে সরাসরি জাহাজ চলাচলের লক্ষ্যে দুই দেশ কাজ করছে বলে জানিয়েছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, থাইল্যান্ডের র‍্যানং বন্দরের সাথে চট্টগ্রাম বন্দরে দ্রুতই জাহাজ চলাচল শুরু হতে যাচ্ছে। দুই বছর আগে এ সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। দ্রুত দুই দেশের যৌথ বৈঠক হবে।

৬ ফেব্রুয়ারি সচিবালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মাকাওয়াদি সুমিতমোর সাথে সাক্ষাৎ শেষে তিনি এসব তথ্য জানান। খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেন, আমরা দ্রুত ব্যবসায়িক কাজ চালু করতে পারব। বর্তমানে সিঙ্গাপুর ও কলম্বো হয়ে থাইল্যান্ডে যেতে হয়। এতে জাহাজ চলাচলে সময় লাগে ২০ থেকে ২২ দিন। সরাসরি জাহাজ চলাচল শুরু হলে সময় লাগবে তিন থেকে চার দিন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, থাইল্যান্ড বাংলাদেশের নতুন সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছে। থাইল্যান্ডের সাথে বাংলাদেশের ৫০ বছরের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। সে সম্পর্ক যাতে আরও জোরদার হয় সে লক্ষ্যে দুই দেশ কাজ করছে।

আন্তর্জাতিক নৌ সংস্থায় (আইএমও) বাংলাদেশ 'সি' ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত হওয়ায় থাইল্যান্ড বাংলাদেশকে

অভিনন্দন জানিয়েছে এবং ভালোভাবে কাজ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে বলেও জানিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী।

যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করেছে চট্টগ্রাম বন্দর

যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করেছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। ২১ ফেব্রুয়ারি সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান দপ্তর বন্দর ভবন, অন্যান্য ভবন, ওয়ার্কশপ, আবাসিক ভবন, বিদ্যালয় ও বন্দরে অবস্থানরত সকল জাহাজ ও জলযানসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। সকাল ৮টায় বন্দর কর্তৃপক্ষ উচ্চ বিদ্যালয়-সংলগ্ন শহীদ মিনারে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল পর্ষদ সদস্যবৃন্দসহ জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এ ছাড়া বন্দরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, সকল স্কুল, কলেজ, ক্লাব, ইনস্টিটিউট, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বন্দর এলাকার সকল সংঘ ও সমিতি পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। পুষ্পস্তবক অর্পণের পর শহীদ মো. ফজলুর রহমান মুন্সী অডিটোরিয়ামে ভাষাশহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান, ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে রচনা ও সুন্দর হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বন্দর চেয়ারম্যান হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, আজকের দিবসটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মাতৃভাষার জন্য আত্মত্যাগ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। আমরাই একমাত্র জাতি, যারা মাতৃভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছি।

তিনি আরও বলেন, একমাত্র বাঙালি জাতি ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো জাতি ভাষার জন্য রক্ত দেয়নি। মাতৃভাষা আন্দোলনে তাদের আত্মত্যাগ বিশ্বের দরবারে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে, যেটা আমাদের গর্বের বিষয়।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, মাতৃভাষার চর্চা করতে হবে। মাতৃভাষাকে বুকে ধারণ করতে হবে। মাতৃভাষাকে ভালোবাসতে হবে। মাতৃভূমিকে ভালোবাসতে হবে। ২১ ফেব্রুয়ারি আমাদের ভাষার সুরক্ষা দিয়েছে এবং এরই সূত্র ধরে ক্রমান্বয়ে দিয়েছে স্বাধীনতা। এ সময় তিনি শিক্ষকদেরকে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বন্দর চেয়ারম্যান উপস্থিত সকলকে ২১ এর চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে অবদান রাখার আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ভাষাশহীদ ও মুক্তিযুদ্ধে নিহত শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বন্দর চেয়ারম্যান তার বক্তব্য শেষ করেন।

পরে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে দিবসটির তাৎপর্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

জোহরের নামাজের পর বন্দর চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও বিভাগীয় প্রধানগণ ৮ নং সড়কে বন্দর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে দোয়া মাহফিলে অংশ নেন। এতে ভাষাশহীদের আত্মার মাগফিরাত এবং জাতির সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

তেল পরিবহনে বছরে খরচ কমবে ৮০০ কোটি টাকা

গভীর সাগরে নোঙর করা মাদার ভেসেল (বড় জাহাজ) থেকে লাইটারেজে (ছোট জাহাজ) করে না নিয়ে পাইপলাইনের মাধ্যমে জ্বালানি তেল খালাসের জন্য সরকার ৭ হাজার ১২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এ প্রকল্পের অংশ হিসেবে কক্সবাজারের কুতুবদিয়ার অদূরে গভীর সমুদ্রে নির্মাণ করা হয় ভাসমান জেটি। প্রকল্পটি সাত মাস আগে উদ্বোধন করা হয়েছে। পরীক্ষামূলক পরিবহনের পর এখন তেল পরিবহন শুরু হয়েছে। ‘ইনস্টলেশন অব সিঙ্গল পয়েন্ট মুরিং উইথ ডাবল পাইপলাইন’ শীর্ষক এ প্রকল্পের অংশ হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছে ভাসমান জেটি ‘সিঙ্গল পয়েন্ট মুরিং’। ফলে এ খাতে বছরে ৮০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে বলে জানিয়েছেন বিপিসির কর্মকর্তারা।

জানা গেছে, জার্মানির একটি বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে চায়না পেট্রোলিয়াম পাইপলাইন অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি এই প্রকল্পের কাজ করে।

গত বছরের জুলাই মাসে তেল খালাসের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু ক্রুড অয়েল খালাস শুরু হলে পাইপলাইনসহ প্রকল্পে বেশকিছু ত্রুটি ধরা পড়ায় তা আর সম্ভব হয়নি। পরে ত্রুটি সারিয়ে ১ ডিসেম্বর সৌদি আরব থেকে আমদানি করা ৮২ হাজার টন ক্রুড অয়েলবাহী জাহাজকে বঙ্গোপসাগরে স্থাপিত ভাসমান জেটিতে ‘সিঙ্গল পয়েন্ট মুরিং’-এ বার্থিং দেওয়া হয়। জাহাজটি ক্রুড অয়েল খালাস করে চলে যাওয়ার একদিন পরই আরেকটি জাহাজ ৬০ হাজার টন ডিজেল খালাস করে। সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিংয়ে থাকা ক্রুড অয়েল ও ডিজেল পাইপলাইনের জটিলতায় ইস্টার্ন রিফাইনারিতে আনা সম্ভব হয়নি। এখন এসব তেল পরিবহন করে রিফাইনারিতে আনা হয়েছে।

ইস্টার্ন রিফাইনারির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ লোকমান বলেন, গত ডিসেম্বরে সাগরে ভাসমান মুরিং থেকে ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ দুটি পাইপলাইনে মহেশখালীর স্টোরেজ ট্যাংক টার্মিনালে ডিজেল এবং ক্রুড অয়েল পরিবহন করা হয়েছিল। ট্যাংক টার্মিনাল থেকে সাগরের তলদেশ দিয়ে ৯৪ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের দুটি পাইপলাইন পৌঁছেছে চট্টগ্রামের ইস্টার্ন রিফাইনারিতে। এই ৯৪ কিলোমিটার পাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহনের ক্ষেত্রে সবসময় ১২ হাজার টন তেল লাইনে থেকে যাবে।

মহেশখালীর স্টোরেজ ট্যাংক টার্মিনাল থেকে পাম্প করে চট্টগ্রামের ইস্টার্ন রিফাইনারিতে ৬০ হাজার টন ডিজেল পাঠাতে সময় লাগবে প্রায় ১৭ ঘণ্টা।

প্রকল্পটির পরিচালক শরীফ হাসনাত বলেন, আগে বহির্নোঙরে নোঙর করা মাদার ভেসেল থেকে লাইটারেজে তেল পরিবহন করা হতো। এখন সেই খরচটি পুরোপুরি বেঁচে যাবে। অন্যদিকে একটি জাহাজ থেকে তেল খালাস করতে আগে ১৫ দিন সময় লাগত, এখন ৩৬ থেকে ৪৮ ঘণ্টায় নেমে আসবে। এতে করে প্রতি বছর সাশ্রয় হবে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা।

তিন সমুদ্রবন্দর ব্যবহারে আগ্রহী নেপাল

দেশের চট্টগ্রাম, মোংলা ও পায়রা বন্দর ব্যবহারে আগ্রহ প্রকাশ করছে নেপাল। বিশেষ করে মোংলা বন্দর ব্যবহারে বাংলাবান্ধা দিয়ে যাতায়াতে ও পণ্য পরিবহনে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে দেশটি। ১৩ ফেব্রুয়ারি সচিবালয়ে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর সাথে নেপালের রাষ্ট্রদূত জ্ঞানস্যাম ভাণ্ডারী সাক্ষাৎ করে এই আগ্রহের কথা প্রকাশ করেন। মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রীর দপ্তরে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

নেপালের সাথে বাংলাদেশের অনেক চুক্তি আছে। সবদিক থেকে সম্পর্ক ভালো। নেপালের অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী বাংলাদেশে লেখাপড়া করে। নেপাল স্থলপথে ভারতের কিছু অংশ ব্যবহার করে বাংলাদেশের বাংলাবান্ধা ও বুড়িমারী স্থলবন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে যাতায়াত করে থাকে।

সাক্ষাৎ শেষে খালিদ মাহমুদ চৌধুরী জানান, ভারতের ২৩ কিলোমিটার ভূমি সরাসরি ব্যবহার করে কীভাবে নেপাল বাংলাদেশের সাথে যুক্ত হতে পারে, সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এই রুটটি সরাসরি ব্যবহারে বাংলাদেশ, ভারত ও নেপাল একসাথে কাজ করবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফরের সময়ে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই রুটটি চালু হলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে।

নেপালের পক্ষ থেকে বন্দর ব্যবহার করে বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্প্রসারণে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে কথা

২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যান ও পর্ষদ সদস্যবৃন্দ

ছবিতে সংবাদ

টার্মিনাল পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান রেড সি গেটওয়ে টার্মিনালের সাথে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের এক সভা ২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল।

চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল ১১ ফেব্রুয়ারি পানগাঁও ইনল্যান্ড কনটেইনার টার্মিনাল পরিদর্শন করেন। এ সময় বন্দরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিনিধিদল ২৯ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

জাইকার একটি প্রতিনিধিদল ২৮ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তারা দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করেন।

টার্মিনাল অপারেটিং প্রতিষ্ঠান ডিপি ওয়ার্ল্ডের উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদল ৬ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

হচ্ছে। এই বিষয়টিকে আমরা অনেক বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি।

নৌপ্রতিমন্ত্রী জানান, নেপালের রাষ্ট্রদূত বাংলাবান্ধা ও বুড়িমারী স্থলবন্দর পরিদর্শন করেছেন। তিনি বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন দেখে খুবই খুশি।

রপ্তানি বৃদ্ধিতে বন্দর সেবা আরও সহজতর করার দাবি ব্যবসায়ীদের

রপ্তানি সম্প্রসারণ ও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে বন্দর সেবা আরও সহজীকরণের দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা। ৪ ফেব্রুয়ারি এফবিসিসিআই স্ট্যান্ডিং কমিটি অন পোর্ট অ্যান্ড শিপিংয়ের প্রথম সভায় তারা এ দাবি জানান।

কমিটির সদস্যরা জানান, চলমান বৈশ্বিক সংকটের কারণে দেশে কস্ট অব ডুয়িং বিজনেস অর্থাৎ ব্যবসায় পরিচালন ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছেন স্থানীয় উদ্যোক্তারা। এমন পরিস্থিতিতে, পণ্য বা কাঁচামাল আমদানি-রপ্তানির প্রক্রিয়া আরও বেশি সহজতর করা জরুরি।

তাদের মতে, চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরসহ অন্যান্য বন্দরে কনটেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বৃদ্ধি, জেটির সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ, হেভি লিফট স্থাপন, কাস্টমস এবং এইচএস কোড সংক্রান্ত জটিলতা দূরীকরণ, রপ্তানি পণ্য জাহাজীকরণের সময় (লিড টাইম) হ্রাস, বন্দরগুলোতে টেস্টিং ল্যাবের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা গেলে রপ্তানি খাত উপকৃত হবে।

কমিটির চেয়ারম্যান তরফদার মো. রুহুল আমিন বলেন, আগামীতে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দেশের ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। পণ্য ও কাঁচামাল আমদানি-রপ্তানিতে বিদ্যমান সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধান করতে হবে।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এফবিসিসিআইয়ের সিনিয়র সহসভাপতি মো. আমিন হেলালী বলেন, পোর্ট ও শিপিং সেক্টরে ৮ থেকে ১০টি স্টেকহোল্ডার (অংশীজন) রয়েছে। সব পক্ষের সমস্যাগুলো পর্যালোচনা করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা তৈরির মাধ্যমে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বৈঠকে আলোচ্য মতামতগুলো লিখিত আকারে এফবিসিসিআইতে জমা দেওয়ার আহ্বান জানান মো. আমিন হেলালী। ব্যবসায়ীদের এসব সমস্যা নিয়ে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে এফবিসিসিআই আলোচনা করবে বলেও জানান তিনি।

চট্টগ্রাম বন্দরে বিএসটিআই ল্যাবের আধুনিকায়ন চায় এফবিসিসিআই

চট্টগ্রাম বন্দরে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের (বিএসটিআই) ল্যাবরেটরিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন ও পরীক্ষার সক্ষমতা বাড়াতে শিল্প মন্ত্রণালয়কে আহ্বান জানিয়েছে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন দ্য ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)। ৬ ফেব্রুয়ারি শিল্প মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনের সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে এই আহ্বান জানান এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম।

মাহবুবুল আলম বলেন, উপযুক্ত শিল্পনীতি প্রণয়নের মাধ্যমে শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সংস্কার, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ, পণ্য উন্নয়ন ও মূল্য সংযোজন, মেধাসম্পদের অধিকার সংরক্ষণ, খাতভিত্তিক দক্ষ জনশক্তি তৈরি, উৎপাদনশীলতা ও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি, উদ্ভাবন ও গবেষণা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে শিল্প মন্ত্রণালয়।

ব্যবসায় ব্যয় হ্রাসে চট্টগ্রাম বন্দরের গুরুত্বের কথা তুলে ধরে এফবিসিসিআই সভাপতি বলেন, চট্টগ্রাম বন্দরে বিএসটিআই'র ল্যাবরেটরিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত প্রযুক্তির ঘাটতি থাকায় ব্যবসার ব্যয় অনেকাংশে বেড়ে যাচ্ছে। প্রধান সমুদ্রবন্দরটিতে দ্রুত আধুনিক পরীক্ষণ যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি স্থাপন করা গেলে সেখানে পণ্য খালাস প্রক্রিয়া আরও সহজ ও দ্রুততর হবে। এতে ব্যবসার ব্যয় কিছুটা কমে আসবে।

এ সময় শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেন, দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে ও ব্যবসার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে এফবিসিসিআই'র সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে শিল্প মন্ত্রণালয়। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরে বিএসটিআই'র ভবনের নির্মাণকাজ অনেক দূর এগিয়েছে। নির্মাণ সম্পন্ন হলে চট্টগ্রাম বন্দরে বিএসটিআই'র আধুনিক পরীক্ষাগার স্থাপন হবে।

সারা বিশ্বে মোট নিঃসৃত কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রায় এক-চতুর্থাংশ শোষণ করে নেয় সমুদ্র। এই শোষিত কার্বনের বড় একটি অংশ জমা থাকে ব্লু কার্বন হিসেবে। ভূমণ্ডল ও মানবজাতির জন্য কল্যাণকর এই প্রক্রিয়ায় অসামান্য অবদান যার, সেই উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্র নিজেই আজ হুমকির মুখে। আর এর জন্য সবচেয়ে বড় দায় মানুষের অপরিণামদর্শী আচরণ। ব্লু কার্বন ইকোসিস্টেমের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে না পারলে তার জন্য ভুগতে হবে আমাদেরই।

ব্লু কার্বন

উপকূলীয় ও সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে শ্বাসমূলীয় বন, সামুদ্রিক তৃণভূমি, নিচু জলাভূমি ইত্যাদি বিপুল পরিমাণে কার্বন শোষণ ও জমা করে রাখে। সঞ্চিত এই কার্বনকে বলা হয় ব্লু কার্বন।

সামুদ্রিক কার্বনের ৭০% সঞ্চয় : সাগর-মহাসাগরের মোট সারফেস এরিয়ার মাত্র শূন্য দশমিক ৫ শতাংশেরও কম জায়গা জুড়ে রয়েছে উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্র। অথচ এটি সমুদ্র কর্তৃক শোষিত মোট কার্বনের প্রায় ৭০ শতাংশ জমা রাখে।

বনভূমির চেয়ে বেশি সঞ্চয় : প্রতি ইউনিট আয়তন হিসাব করলে মূল ভূখণ্ডের বনের চেয়ে বেশি কার্বন জমা রাখে শ্বাসমূলীয় বন, সামুদ্রিক তৃণভূমি ও নিচু জলাভূমি।

সামুদ্রিক ঘাস : খুব দ্রুত বাড়ে। পাতা ও শিকড় গঠনের জন্য সমুদ্রের পানি থেকে কার্বন শোষণ করে। সামুদ্রিক তৃণভূমি পলি ও মৃত জৈবিক পদার্থ জমা হওয়ার জন্য আদর্শ, যেগুলোও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কার্বন শোষণ করে।

শ্বাসমূলীয় বন : সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন শোষণ করে। গাছের পাতা, কাণ্ড ও শিকড় কার্বন সঞ্চয়ের জন্য আদর্শ। এছাড়া এগুলোর গোড়ায় জমা হওয়া পলিও কার্বন শোষণ ও সঞ্চয় করে।

নিচু জলাভূমি : এসব জায়গার গাছপালা কার্বন জমা করে রাখার পাশাপাশি পলি জমতেও সাহায্য করে, কার্বন-সমৃদ্ধ মাটির গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

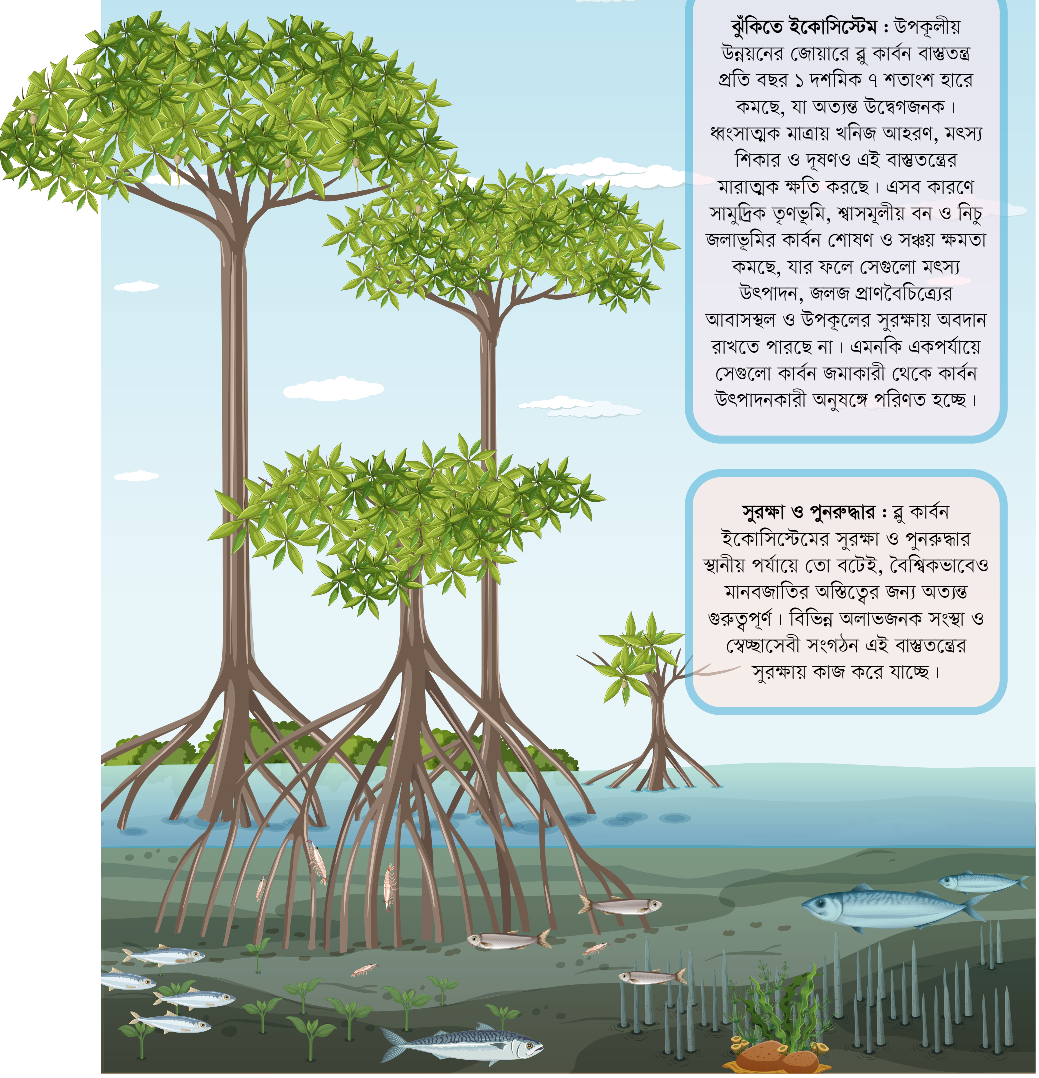

ঝুঁকিতে ইকোসিস্টেম : উপকূলীয় উন্নয়নের জোয়ারে ব্লু কার্বন বাস্তুতন্ত্র প্রতি বছর ১ দশমিক ৭ শতাংশ হারে কমছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ধ্বংসাত্মক মাত্রায় খনিজ আহরণ, মৎস্য শিকার ও দূষণও এই বাস্তুতন্ত্রের মারাত্মক ক্ষতি করছে। এসব কারণে সামুদ্রিক তৃণভূমি, শ্বাসমূলীয় বন ও নিচু জলাভূমির কার্বন শোষণ ও সঞ্চয় ক্ষমতা কমছে, যার ফলে সেগুলো মৎস্য উৎপাদন, জলজ প্রাণবৈচিত্র্যের আবাসস্থল ও উপকূলের সুরক্ষায় অবদান রাখতে পারছে না। এমনকি একপর্যায়ে সেগুলো কার্বন জমাকারী থেকে কার্বন উৎপাদনকারী অনুষঙ্গে পরিণত হচ্ছে।

সুরক্ষা ও পুনরুদ্ধার : ব্লু কার্বন ইকোসিস্টেমের সুরক্ষা ও পুনরুদ্ধার স্থানীয় পর্যায়ে তো বটেই, বৈশ্বিকভাবেও মানবজাতির অস্তিত্বের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন অলাভজনক সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এই বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে।

খতিয়ান

বন্দরের কার্গো ও কনটেইনার ওঠানামার মাসিক পরিসংখ্যান

২০২৩ ও ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের তুলনামূলক চিত্র

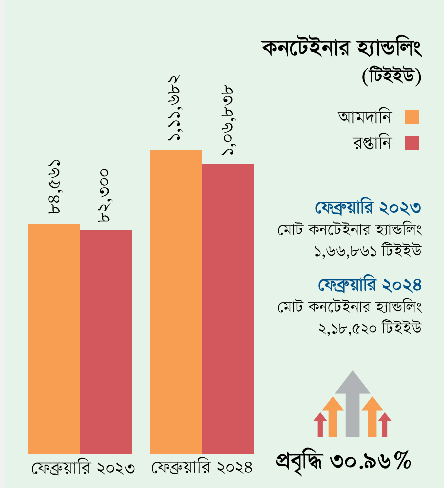

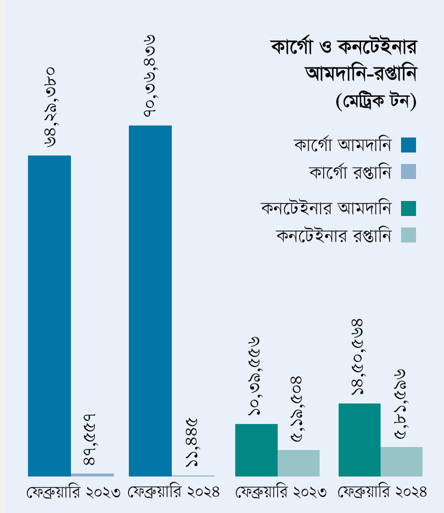

তথ্যযোগ

১. মাহমুদুল হাসান
নিম্নমান বহিঃসহকারী

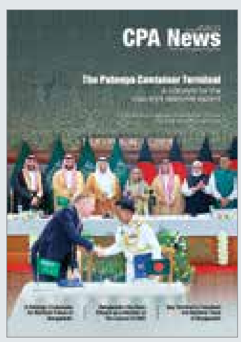

MARITIME MAGAZINE IN ENGLISH FROM CPA

Request for your hardcopy:
enlightenvibes
@gmail.com
or find in online:
https://cpanewsbd.com

BANDARBARTA
a monthly maritime magazine by
Chittagong Port Authority